প্রথম প্রকাশ ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

ONLY OFFICIAL NEWSPAPER OF CAB

প্রকাশনায় : বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ | CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL | NORTH AMERICA

উদযাপন

আশ্বিন ১৪৩১ অক্টোবর ২০২৪

Sangbad Bichitra—October 2024.
Published by Cultural Association of Bengal, North America.

উদযাপন

প্রথম প্রকাশ : ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

সংবাদ বিচিত্রা
SANGBAD BICHITRA
ONLY OFFICIAL NEWSPAPER OF CAB
প্রকাশনায় : বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ ▪ CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL ▪ NORTH AMERICA

আশ্বিন ১৪৩১ ০ অক্টোবর ২০২৪
Visit us at : www.cabusa.org

Sangbad Bichitra
Only Official Newspaper of
Cultural Association of Bengal
North America

প্রকাশক ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ
উত্তর আমেরিকা

গ্রন্থস্বত্ব ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ
উত্তর আমেরিকা

প্রকাশকর্ম সহযোগিতায়

RAUNAQ PUBLICATION

রূপা মজুমদার
Raunaq Publication
কলকাতা, ভারত

প্রচ্ছদ ঃ সৌজন্য চক্রবর্তী
কলকাতা, ভারত

সম্পাদকমণ্ডলী
সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়
লিপিকা মুখোপাধ্যায়
উত্তর আমেরিকা

অক্ষরবিন্যাস
মেগাবাইট
কলকাতা, ভারত

উদযাপন—কিছু কথা

"উৎসব তো আমরা রচনা করতে পারি নে, যদি সুযোগ হয় তবে উৎসব আমরা আবিষ্কার করতে পারি। সত্য যেখানেই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানেই উৎসব" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।

পুজো পালনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে স্মরণ এবং শ্রদ্ধা আর উদযাপনের সঙ্গে জড়িত থাকে অর্জন এবং উৎসব। আর এই দেবীর আরাধনায় যে বৈদিক সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ হয় সেই সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণে কেবল মনুষ্য জাতির নয়। জড়িয়ে আছে জগতের সকল প্রাণী এবং গাছপালাসহ সারা জগতের মঙ্গল কামনার পবিত্র আকাঙ্ক্ষা।

হয়ত তাই আশ্বিনের শারদপ্রাতে দেবী শারদার অকালবোধন আজ শুধু আর বাঙালীর ধার্মিক প্রথা পালন নয় এখন ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ও বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। বিশ্ববাঙালীর কাছে বাঙালীয়ানার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবের এক সার্বজনীন উদযাপন।

তবে একমাস আগে ঘটে যাওয়া আরজি কর হাসপাতালে কর্মরত তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস হত্যা ও তার পরবর্তী ঘটনাবলি মানুষের মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সেই নারকীয় ঘটনা এখনও ভুলতে পারেনি মানুষ। সর্বস্তরের মানুষ পথে নেমে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। সকলেই চান—'নির্যাতিতা বিচার পাক', দুর্নীতি ও হুমকি-প্রথার অবসান হোক।

মন থেকে উৎসব করার মানসিকতা আজ কারোরই নেই, তবু এই উৎসব অনেক মানুষের কাছে রুজি-রোজকারের জায়গা। উৎসবে ফিরছি না বললে হয়ত অনেক মানুষের ক্ষতি হবে।

তাই আমরা সবাই চাই পুজো এবার পালিত হোক 'উৎসবের নাম হোক বিপ্লব' উদযাপিত হোক প্রতিবাদ।

দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত আদ্যাশক্তি মহামায়ারা এবং সমস্ত সংবেদনশীল মানুষ সিস্টেম নামক সামাজিক প্রথা ও অসুর কুলকে বিনাশ করার জন্য পথে নামুক।

শিকড় থেকে দূরে থেকেও এই অনাকাঙ্খিত লড়াইয়ে যেমন সামিল হয়েছি আমরা, অনাবাসী বাঙালীরা। তেমনি এই ভাষা সংস্কৃতিকে জিইয়ে রাখার লড়াইয়েও সামিল হয়েছেন যে সব অভিবাসী সাহিত্য অনুরাগী তাদের লড়াইকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

তাই আমাদের শারদীয়া ডিজিটাল পত্রিকা এবারেও উদযাপন করছে তাদের সৃজন। পাশাপাশি দেশের সাহিত্যিক'রাও আমাদের হাতে হাত রেখেছেন।

আশাকরি এই সাহিত্যচয়ন আপনাদের ভাল লাগবে।

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক

উদযাপন—কিছু কথা

হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা সব ধর্মাবলম্বীদের উৎসব, বাংলার আপামর জনসাধারণ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে নিখাদ আনন্দ ও সৌভ্রাতৃত্বের কারণে দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণ করে।

এই উৎসব বাঙালির ধর্মচিন্তা সমাজ চেতনাকে যেমন স্পর্শ করেছে তেমনি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে চারুকলাচর্চার ক্ষেত্রে ত্রিনয়নী দুর্গা প্রতিভাত হয়েছেন নানা রসে এবং রঙে।

এখন থিমের যুগ। মণ্ডপ দেখার আকর্ষণই সবচাইতে বেশি। অবশ্য প্রতিমা দর্শন ব্যাপারটাও একটা বড় ব্যাপার। প্রচলিত কথায় বলে 'ঠাকুর দেখা'। তো সেই ঠাকুরের অভিনবত্ব এখন একটা দেখবার জিনিস।

আধুনিক শিল্পীদের কাছে প্রতিমা নিছক প্রতিমা নয় একটা আর্ট। প্রতিমার রূপভঙ্গি ভাব নিয়ে যেমন পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষ নেই, তেমন অন্ত নেই মাটির বদলে প্রতিমা তৈরীর উপাদান উপকরণ নিয়ে। তামা, পিতলের জাল, মাছের আঁশ, বর্জিত লোহা লক্কর, ফাইবার গ্লাস, নারকেলের খোল, সাবান, খেলনা লাট্টু, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি প্রভৃতি কি নেই? জুয়েলারি হাউজগুলো নিজেদের ডিজাইন করা অলংকার দিয়ে প্রতিমাকে সাজায়।

ভাবনার দিক থেকেও দুর্গা অসুরের সংগ্রামের চিরন্তন পৌরাণিক সূত্রটিকে অতিক্রম করে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে। নতুন থিমের প্রয়োগে দর্শনার্থীরা চমকে উঠছে। প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাওয়ার গৌরব অর্জন করতে চলেছে রেষারেষি এবং এতে উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলোর দেওয়া প্রতিযোগিতামূলক শারদ সম্মান। পাল্লা দিয়ে এগিয়ে আসছেন লাখ লাখ টাকার স্পন্সরশিপ, কারণ বাজেট তো প্রতিবছরই বাড়ছে। ঢালাও এক্সপেরিমেন্ট ঢালাও বাজেট। আসলে দুর্গাপূজো এখন পুরোপুরি কর্পোরেট। এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সৃষ্টি হচ্ছে নান্দনিকতা। এমনকি প্রতিমা এবং প্যান্ডেল আজকাল সংরক্ষণ করে মিউজিয়ামেও রাখা হচ্ছে। শুরু হয়েছে পূজা কার্নিভাল যেটা সরাসরি টেলিকাস্ট হয়ে চলে যাচ্ছে সারা বিশ্বের ড্রয়িং রুমে। এমনকি সংবাদ মাধ্যমগুলির ডিজিটাল প্লাটফর্মের দরুন বাংলা দুর্গা পুজো এখন ডিজিটাল। সারা বিশ্বের মানুষ ডিজিটাল মাধ্যমেই অঞ্জলি দিতে পারছেন। বাংলার দুর্গা পুজো বিবর্তিত রূপ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ মানুষের রুচিবোধের বিবর্তন হয়েছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে বলেই দুর্গাপুজো এখনো শ্রেষ্ঠ, প্রাসঙ্গিক এবং এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। ইউনেস্কোর দ্বারা হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পর দুর্গাপুজা কিন্তু শুধু বাঙালিরা নয়, এই উৎসব এখন বিশ্ববাসীর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন সংগঠন বিদেশীদের নিয়ে আসে দুর্গাপুজোর ট্যুর করাতে এবং এই সকল কিছুর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আমাদের সাজসজ্জায় উৎসারিত হয়েছে নতুন স্পন্দন, নতুন সংবেদন, নতুন জেন ওয়াই ফেশান। পুরনোর সঙ্গে নতুনের মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছে এক চমৎকার বিশ্ব বাজারের ফ্যাশন যেটা অন্তর্দেশীয় পরিসরে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে।

অথচ, ভাবতে অবাক লাগে একদম প্রাচীনকালে প্রতিমা জিনিসটাই ভূ-ভারতে ছিল না। বৈদিক যুগে মূর্তিপুজোর রেওয়াজ ছিল না একেবারেই। কেবল যজ্ঞের শেষে পূর্ণাহূতি দেওয়ার পর ধ্যান করার নিয়ম ছিল। বৈদিক যুগে দেব-দেবীদের মন্দিরও ছিল না। শাস্ত্রমতে, দুর্গা, কালী, তারা, কমলা, জগদ্ধাত্রী সকলেই ছিলেন বীজমন্ত্রগত ধ্যানের দেবতা। তারা একই মহামায়ার বিভিন্ন রূপ। তন্ত্রে স্পষ্ট করে বলা আছে, মা হলেন শতরূপা। জগতে যত সাধক, মায়ের রূপও তত রকমের। এই কারণেই ভারতবর্ষের কোনও প্রাচীন মন্দিরে দেবতার রূপবিগ্রহ মেলে না। সেখানে আছে প্রস্তরখণ্ড। যেমন, কাশীর অন্নপূর্ণা আসলে একখণ্ড পাথর মাত্র। সেই পাথরের মাথায় বসানো আছে সোনার মুখ। আর আছে দুই পাশে দুইখানা সোনার হাত। কালীঘাটের মা কালীর দিকে তাকালেও এই রূপই প্রত্যক্ষ করি আমরা। পূর্ণাঙ্গ মূর্তিপুজোর প্রবর্তক বৌদ্ধরা। প্রতিমাশিল্পের সূচনাও হয় ওই বৌদ্ধদের আমলেই।

বিভিন্ন পুরাণে আমরা দুর্গাপুজোর উল্লেখ পাই। প্রাচীন কালেও যে দুর্গা পুজোর প্রচলন ছিল সে কথা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়। সিন্ধু সভ্যতায় পশুপতি শিবের পূজার প্রচলন ছিল। দুর্গা ছিলেন শিবের অর্ধাঙ্গিনী, সেই হিসেবে তখন দুর্গার

উৎসব হয়েও থাকতে পারে। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানে মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে পন্ডিত ভবদেব ভট্ট দুর্গার মাটির-মূর্তি পূজার কথা বলে গেছেন। চতুর্থ শতাব্দীতে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি 'দুর্গা ভক্তি তরঙ্গিনী' ও বাঙালি পন্ডিত শূলপানি 'দুর্গোৎসব বিবেক' বইদুটিতে দুর্গা উৎসবের উল্লেখ করে গেছেন। পরবর্তীতে যে সময়টাকে শ্রীচৈতন্য সেবকদের অভ্যুদয়কাল বলা হয়, সেই সময় বাংলায় মাটির প্রতিমা গড়ে পুজোর প্রচলন হয়। ব্যাপক আকারে তা বিস্তারও লাভ করে।

আধুনিক যে প্রতিমাশিল্প, তার জন্ম কিন্তু মাত্র ৮০০ বছর আগে। নেপথ্যে ছিলেন তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। জানা যায়, তিনিই প্রথম মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়ে দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন। এরপর ভাদুড়িয়ার মহারাজা জগৎনারায়ণ রায় ঘটা করে দুর্গাপুজো করেন। সেকালে পুজোর আয়োজনে নয় লক্ষ টংকা ব্যয় করেছিলেন। তবে কিনা তা ছিল বাসন্তী দুর্গাপুজো।

এর পরবর্তী ধাপের কাহিনী অবশ্য বেশিদিন আগেকার নয় সেটা হল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারা বাংলায় শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রবর্তন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্গা পুজোর গল্প এখন সকলেরই জানা। কলকাতার বড়িশায় রায়চৌধুরী পরিবার কোচবিহারের রাজবাড়ি সর্বত্রই মহাসমারোহে দুর্গোৎসব আয়োজনের তথ্য পাওয়া যায়। এমনকি অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়রা জাঁকজমক সহকারে দুর্গোৎসবে অংশগ্রহণ করে গেছে।

রাজা নবকৃষ্ণর নামই যখন উঠল তখন তার পুজোর ছোট্ট বিবরণ দেয়া যাক। ১৭৫৭ সালে তিনি নতুন পুজোর দালান তৈরি করেছিলেন। ক্লাইভকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। নাচ-গান, খানাপিনার ঢালাও ব্যবস্থা। সুতানুটি কলকাতা গোবিন্দপুর কালীঘাট এবং আশেপাশের লোক ভেঙে পড়লো দুর্গাঠাকুর দেখার জন্য। পুজোর পাশাপাশি ছিল কবিগান, আখড়াই, বাই নাচ, যাত্রা ইত্যাদি। নৈবেদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল সরভাজা এবং সরপুরিয়া। এক ছড়া খাঁটি দুধ নরম আঁচে জ্বাল দিয়ে সর তৈরি করতে হয়। শোনা যায় সরভাজা এবং সরপুরিয়ার প্রথম আইডিয়া বেরিয়েছিল গোপাল ভাঁড়ের মাথা থেকে। সেই আইডিয়াকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন রাজবাড়ির তখনকার প্রধান মিষ্টান্ন শিল্পী। এবং গোপাল ভাঁড়ের সুপারিশে সেই শিল্পীকে রাজা পুরস্কৃত করেন।

একইরকমভাবে সাবর্ন রায়চৌধুরীর নামটাও চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বাংলার দুর্গা উৎসব ইতিহাসে। এঁদের পুজোর ইতিহাস, ঐতিহ্য, আভিজাত্য, জাঁকজমক সম্পর্কে বিবরণ লিখতে গেলে অধ্যায়ের পর অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে। তবে যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা হলো আজও রায়চৌধুরীর পরিবারের দুর্গোৎসব পালিত হয়। বড়িশার সাবর্ন রায়চৌধুরীর পরিবারে এখন মোট চারটি দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। একটি আটচালা, অন্য তিনটি হল বেনাকি বাড়ির পুজো, কালী কিংকর হাউসের পুজো এবং মেজো বাড়ির পুজো। আজকের যুগে দিকেদিকে সর্বজনীন দুর্গোৎসবের জয়যাত্রা চলছে। তাই বাড়ির পুজোগুলো তুলনায় হয়তো নিষ্প্রভ খানিকটা। তবে বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোর আভিজাত্য এবং গুরুত্ব অন্য মাত্রা লাভ করেছে, তাই এই পুজো দেখতে আজও মানুষ আকর্ষিত হয়, মানুষের ঢল নামে রাস্তায়। বিভিন্ন সংগঠক বনেদি বাড়ির পুজোর ট্যুর করায়। বনেদি বাড়ির পুজোর নাম করলে প্রথমেই আসবে হাটখোলা দত্তবাড়ি দুর্গাপুজো। তারপর একে একে একে উত্তর কলকাতা চিৎপুরের গোস্বামী বাড়ির দুর্গাপুজো, কুমারটুলির কবিরাজবাড়ী, বাগবাজারের হালদারবাড়ি, বরানগরের দাঁ পরিবার, বরানগরের সেন পরিবার—এগুলো ইতিহাসে উল্লেখিত আছে।

গত ৩০০ বছর বাংলার মৃৎশিল্পীদের হাতে দেবী দুর্গার একটি বিশেষ মৃন্ময়ী শিল্পরুপ গড়ে উঠেছে। আধুনিক ভাস্কররা ঐ শিল্পরূপকে অতিক্রম করে দেবী দুর্গার রূপসম্পাতে আরোপ করেছেন নিজের অনুভূতি, উপলব্ধি বিশেষ করে উপাদান আঙ্গিক ও রূপক কল্পনায়। অবশ্য গত শতকেও প্রতিমার বিবর্তন লক্ষ্য করা গেছিল।

আর এখন তো বারোয়ারি পুজোর যুগ। বারোয়ারি নামের পেছনে একটি গল্পে আছে। বলা হয় ১৭৯০ সালে দুর্গাপূজায় আকৃষ্ট হয়ে হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়াতে ১২ জন বন্ধু (ইয়ার) চাঁদা তুলে প্রথম সর্বজনীন দুর্গোৎসব আয়োজন করেন। ১২ ইয়ারের পুজো বলেই বারোয়ারি পুজো নামে অভিহিত হয়েছে এই পুজো।

দুর্গা পুজো এমন এক অনুষ্ঠান যেটা চিরকালই সব রকম ভেদাভেদের উর্ধ্বে। সপরিবার মায়ের প্রতিমার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারব যে সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ দুর্গাপুজো। একটি কাঠামোর মধ্যে গোটা পৃথিবীর উদাহরণ পাওয়া যায়—মনুষ্যজগত পশুজগৎ, সরীসৃপ, উদ্ভিদ, গিরিপর্বত সবই দেবীর সাম্রাজ্যের অঙ্গ।

পরিসমাপ্তিতে শুধু একটি কথা—দুর্গা কিন্তু শুধু মৃন্ময়ী প্রতিমা নন, তিনি সত্যিই সমস্ত নারীর মধ্যে শক্তি রূপে অধিষ্ঠিতা।

'মদ্রূপা সকোলা স্ত্রীয়ঃ।'

অর্থাৎ 'জগতের সমগ্র নারী জাতি আমার এক একটি রূপ।' প্রতিটি ঘরেই তিনি বিরাজিতা—কখনো কন্যা কখনো জায়া কখনো বা জননী রূপে। তাই দুর্গাপুজো করার পাশাপশি যদি রমণীদের যথাযথ সম্মান দেওয়া সম্ভব হয় তবে দুর্গা পুজো সার্থকতা পাবে। নারীদের সম্মান ভুলুণ্ঠিত করা অমার্জনীয় অপরাধ, এই নীতি শিক্ষাটা হৃদয়ঙ্গম করার মধ্যেই মায়ের পুজো স্বার্থকতা পাবে। বর্তমানের অস্থির সময় এইটাই একমাত্র আপ্তবাক্য। জয়তু।

রূপা মজুমদার।

রূপা মজুমদার

প্রকাশকর্ম সহযোগিতায়

Raunaq Publication

কলকাতা, ভারত

সূচিপত্র

পুরাতনী

একটি ঘটনা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	গল্প	৯
পাগলীর হাসি	বনফুল	গল্প	১৩
বসন্তের দাগ	দিব্যেন্দু পালিত	গল্প	১৬
অঙ্কফল	আশাপূর্ণা দেবী	গল্প	২০
তৃষ্ণা	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	গল্প	২৭

নবপত্রিকা

জীবন	যশোধরা রায়চৌধুরী	কবিতা	৩৫
মেঘবৃষ্টির কাব্য	সায়ন তালুকদার	কবিতা	৩৫
বেঁচে থাকা মরে যাওয়া	অমর মিত্র	গল্প	৩৬
পুরনো লণ্ঠন	কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়	গল্প	৪০
মেঘের ছায়া	ঋতা বসু	গল্প	৪৫
বোঁ ভয়াজ	দীপান্বিতা রায়	গল্প	৫০
খেলাঘরের মতো	রাজশ্রী বসু অধিকারী	গল্প	৫৫
মহড়ার কাঁটা	দেবযানী বসু কুমার	গল্প	৬১
কী করবে বিভু	সঞ্জীবকুমার দে	গল্প	৬২
বসুধা ও মা সুনয়না	বিতস্তা ঘোষাল	গল্প	৬৫
অষ্টাবক্র মুনির গল্প	সমুদ্র বসু	পৌরাণিক গল্প	৬৯
না থাকিলে খানাখন্দ	বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়	রম্যরচনা	৭৩
অনুভূতি	জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	কবিতা	৭৫

প্রবাসীদের কলমে

সরকার ও দ্রুত উপার্জন	মৃদুল পাঠক	প্রবন্ধ	৮০
সর্বনাম	উদ্দালক ভরদ্বাজ	কবিতা	৮২
রাতের ট্রেন	তাপস কুমার রায়	কবিতা	৮২
অনুভব	তপনজ্যোতি মিত্র	কবিতা	৮৩
ছাপোষা মন	বেনজির শিকদার	কবিতা	৮৩
সাবধানে থেকো, দুগ্গা	শুভশ্রী নন্দী	কবিতা	৮৪
তকমা	মৌমন মিত্র	কবিতা	৮৫
ভ্যাবাচাকা	অনিন্দিতা চৌধুরী	অনুগল্প	৮৬
হেমন্তের চিঠি	মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায়	রম্যরচনা	৮৭
পুজোর স্মৃতি	সফিক আহমেদ	প্রবন্ধ	৮৯

পুরাতনী

একটি ঘটনা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমারই জীবনের একটি ঘটনা। সে আজকের নয়—অনেককাল আগের। ঘটেছিল আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। আমাদের গ্রামেরই উত্তর-পশ্চিম অংশে মুসলমানপাড়া। পাড়াটির নাম ঠাকুরপাড়া। তার সঙ্গে সংলগ্ন পশ্চিমপাড়া ব্যাপারীপাড়া ছোট গোগা মুসলমানপাড়া, পুরানো মহুগ্রাম—সবগুলিতেই মুসলমানদের বসতি। একেবারে অবিচ্ছিন্ন মুসলমান বসতি, এর মধ্যে একটিও হিন্দুর বসতি নেই।

ঠাকুরপাড়ায় ছিল সম্ভ্রান্ত মিয়া বংশের বাস। তাঁদেরই ছিল ঠাকুর উপাধি। এই মুসলমানপ্রধান গ্রামগুলিরই শুধু গুরুস্থানীয় নয় এ অঞ্চলেই ছিল তাঁদের খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা।

এই প্রতিষ্ঠা খ্যাতি তাঁদের বিষয়-সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল না, ছিল অন্য কারণে। বলতে গেলে ওই গুরু বলেই ছিল এই খ্যাতি গুরু হিসাবে—পবিত্র বংশ হিসাবে।

আমরা বাল্যকালে এঁদের প্রাচীনদের দেখেছি। শুনতাম তাঁরা নাকি সিদ্ধযোগীর বংশধর। তাঁরা যোগ করতেন যোগশাস্ত্র মতে। নানান অলৌকিক যৌগিক শক্তির গল্পের কথাও প্রচলিত ছিল আমাদের অঞ্চলে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে। 'আঁসলা' বলে একটি পুষ্করিণী আছে। 'আঁসলা' শব্দটি 'আঁষ' অর্থাৎ আমিষ থেকে। এই পুষ্করিণীর জল স্নানে পানে ব্যবহার কেউ করে না। প্রবাদ—এই ঠাকুর বংশে গুলমহম্মদ ঠাকুর নামে একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি নিত্য প্রাতে এই পুষ্করিণীতে এসে তাঁর উদরের যন্ত্র-অন্ত্র যোগবলে উদ্গিরণ করে পরিষ্কার করে নিয়ে আবার উদরসাৎ করতেন। এই কারণেই উচ্ছিষ্ট দোষে দূষিত হয়েছে। এখনও একটি নিমগাছ আছে যে গাছটি থেকে চিনির রসের মত মিষ্ট ঘন রস নির্গত হয়। লোকে পরিতৃপ্তি সহকারে পান করে এবং বহু রোগ আরোগ্য হয়ে থাকে। এ ছাড়াও নানান প্রবাদ আছে দেশে।

এই বংশটি আমারই চোখের সামনে শেষ হয়ে গেল। এঁদের অনেকেই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

হিন্দুদের মধ্যে প্রবাদ শুনতাম এই বংশে সেই যোগীঠাকুরদের কাল থেকে হিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল, সেই নিষেধবাক্য লঙ্ঘনের ফলেই এই রোগ এই বংশে প্রবেশ করেছে। বংশটি পুরুষদের দিক থেকে শেষ হয়ে যাবার পর এর গুরুত্ব আরও বেড়েছে।

এখন যাঁরা এই ভিটেতে আছেন তাঁরা দৌহিত্র বংশের উত্তরপুরুষ। আরও একটি বিচিত্র কথা এই যে, এই মিয়া বংশ এমন সম্ভ্রান্ত এবং খ্যাতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও জায়গীর জমিদারি বা রাজ্যের অধিকারী ছিলেন না। ঠিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতই ছিলেন নিষ্করভোগী।

এঁদের বাড়িতে তামার পাতে লিখিত বাদশাহী ফার্মান ছিল যার বলে এঁরা অতি উৎকৃষ্ট নিষ্কর জমির মালিক ছিলেন।

এই পরিবারটি ছাড়া এখানকার মুসলমানদের শতকরা নিরানব্বুই জনেরও বেশী সকলেই কৃষিজীবী। প্রত্যেকেই নিজে হাতে চাষ করেছে চাষের সময়, গাড়ি বয়েছে ভাড়ায়, দিন-মজুরিতে মাটি কেটেছে, কাট কেটেছে; কয়েকজন রাজমিস্ত্রীর কাজ করত, তাদের সঙ্গে এরাই মাথায় ইঁট বয়েছে—মাটি কেটে এরাই ইঁট পাড়াইয়ের কাজ করেছে। এদের নিজের জমি বড় একটা ছিল না। ছোট গোগা পুরানো মহুগ্রামে কয়েকজনের জমি ছিল। তাদের সংখ্যা দু'হাতের আঙুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমার বাল্যকালেই এদের দু-চারজন জমির মালিক হল নিজের দেহের শক্তিতে। একটু খুলে বলি। তখন প্রতি গ্রামে বা মৌজায় কিছু কিছু পতিত জমি ছিল; সে সব পতিত সেই আদিকাল থেকেই কুমারীমৃত্তিকা। আর ছিল কিছু কিছু মজা দিঘি। বড় বড় দিঘি মজে গেছে—জল থাকে না, বর্ষাকালে ঘাস জন্মায়, পাঁক হয়, গ্রীষ্মে খটখট করে। বর্ষার শেষে একবার দরিদ্র হিন্দু ব্রাত্যেরা তার কাদা ঘেঁটে পাঁকাল মাছ ধরে। আমার বাল্যকালেই বা তার কিছু পূর্ব থেকে অর্থাৎ ষাট-সোত্তর বছর বা তারও কিছু আগে থেকে এই সব পতিত এবং মজা দিঘি আবাদ করার একটা রেওয়াজ উঠেছিল। জমিদারেরা এদিকে মন দিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দু গৃহস্থেরা পতিত ভাঙতে মজা পুকুর ভেঙে জমি

করতে ভয় পেত সংস্কারের কারণে। বলতো সহ্য হবে না। কিন্তু এই মুসলমানেরা এ সংস্কারে আবদ্ধ ছিল না। তারা এগিয়ে এসেছিল এই সব পতিত এবং মজা দিঘি বন্দোবস্ত নেবার জন্য।

এর সঙ্গে আরও একটা সত্য ছিল—সেটি হল এই সব মুসলমানদের দৈহিক শক্তি। সত্য বলতে তখনকার দিনে দেখেছি মুসলমানদের দেহের শক্তি এবং শ্রমশক্তি ছিল অসাধারণ।

হিন্দুদের অতি নিম্নস্তরে কিছু শক্তিমান সম্প্রদায় ছিল যারা দৈহিক শক্তিতে লাঠিতে মুসলমানদের সমকক্ষ ছিল, কিন্তু তাদের উৎসাহ ছিল না—ভূমির ক্ষুধাও ছিল না। কিন্তু এদের ছিল। এরা এগিয়ে এসে এই সব পতিত বন্দোবস্ত নিয়ে কেবলমাত্র দু'খানি হাত আর কোদালির সাহায্যে জমি কেটে তার মালিক হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আজ বিত্তশালী এবং অনেক ভূমির অধিকারী।

আমার বলবার কথা এ যে, এক ঠাকুরপাড়ার মিয়া বংশ ছাড়া বাকী সকল মুসলমান পরিবারই ছিল শ্রমজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত। এবং এদের মধ্যে নিরানব্বুই জনই ছিল শিক্ষায় বিমুখ।

আমার বাল্যকালে ইস্কুলে যখন পড়েছি তখন ক্লাসে—সে নীচের ক্লাস থেকে উপর ক্লাস পর্যন্ত দশ বছরে মোটমাট দশ-বারোজন ছাড়া মুসলমান সহপাঠী পাই নি। এদের সম্পর্কে কোন ঔৎসুক্যই ছিল না। সত্য বলতে অবজ্ঞাই ছিল এদের প্রতি। ১৯05 সালে বঙ্গভঙ্গের পর একটা শ্লোগান উঠেছিল—'হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান'। আমাদের স্থানীয় থিয়েটারের ড্রপসিনে একটা ছবি ছিল—ভারতমাতা হিন্দু এবং মুসলমানের হাতে হাতে মিলিয়ে দিচ্ছেন এবং তার নীচে ঐ কথাটা লেখা ছিল। তবুও বলব যে এখানকার এই সব মুসলমানদের কেউই ভাই হতে আমাদের কাছে এগিয়ে আসে নি, আমরাও তাদের কাছে গিয়ে হাত ধরে ভাই সম্বোধনে সংবর্ধনা করি নি। শুধু মুসলমান শ্রমজীবীরাই বা কেন হিন্দু সমাজের শ্রমজীবী কৃষিজীবীদেরও ডাকি নি—তারাও আসে নি। তাতে আমাদের মনের মধ্যে কোন স্থানে ফাঁক পড়েছে বলে মনে হয় নি।

* * * *

হঠাৎ এদের সম্পর্কে কৌতূহল জাগল একটি ঘটনায়। ওখানে এই মুসলমানপাড়ার মধ্যে মাটি কাটতে কাটতে একটি দেবমূর্তি উঠল। আমার বাল্যকালে একবার একটি পুকুরের ভিতর থেকে একটি বাসুদেব মূর্তি উঠেছিল, সেটি তৎকালে পুকুরের মালিকের ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজা পাচ্ছিলেন। সেটি সম্পর্কে বাল্যকালে শুনেছিলাম—বর্গীরা এ অঞ্চলে এসেছিল, তারাই মূর্তিটিকে কিছু অঙ্গহানি করে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু আজ ভাল করে ইতিহাস পড়ে জেনেছি যে, বীরভূমের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বর্গী এলেও আমাদের অঞ্চলে কোন দিন আসে নি। তারপর এই মূর্তি উঠল মাটির তলা থেকে। এবং মুসলমানপাড়ার ভিতর থেকে।

তখন আমার বয়স কুড়ি-বাইশ বৎসর।

মূর্তিটি দেখতে গেলাম। লোকে তাকে তারা মূর্তি বলে হৈ হৈ করছে। মূর্তিটি যে কি এবং কার সে নিয়ে খুব গবেষণা করবার মত বিদ্যা জ্ঞান আমার ছিল না কিন্তু একটি ঐতিহাসিক কৌতূহল ছিল। সে কৌতূহলও সেদিন পরিতৃপ্ত হয়েছিল একটি গল্প শুনে। এ অঞ্চলটিতে দুশো বছর আগে বাউড়ী রাজা বলে এক রাজা ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল 'উদাসী'। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা একটি মজা বিরাট দিঘি গ্রামপ্রান্তে ছিল—তার নাম উদাসী দিঘি!

এই রাজার রাজ্যে পারস্য থেকে এক ফকীর এসেছিলেন ঘুরতে ঘুরতে। সে দিন ছিল বকরীদের দিন। ফকীর খোঁজ করেছিলেন সেখানে কোন মুসলমান আছে কি না। ছিল একঘর বা দু'তিনঘর জোলা মুসলমান। নিতান্তই দরিদ্র। একপ্রান্তে বাস করত। ফকীর তার বাড়ি গিয়ে বলেছিলেন—তুমি মুসলমান। আজ বকরীদের পুণ্য দিন। কই তুমি বকরীদ পালন করেছ কই।

জোলা বলেছিল—হজরৎ, আমি গরীব এবং সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প আমরা। তার উপর বাউড়ী রাজার প্রবল প্রতাপ—তাঁর রাজ্যে বকরীদ নিষিদ্ধ। করলে সাজা হবে।

ফকীর বললেন—মুসলমান, তোমার জানের দায় আমার। তুমি নির্ভয়ে পালন কর বকরীদ।

জোলা বকরীদ পালন করছিল। একটি বাছুর জবেহ করে খোদাতয়লার কাছে উৎসর্গ করেছিল। ফকীর তৃপ্ত হয়ে পরদিন সকালে চলে গিয়েছিলেন আপনার পথে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে জোলার ঘটল বিপদ। কাকে একটা হাড় নিয়ে গিয়ে ফেললে বাউড়ী রাজার দেবমন্দিরের অঙ্গনে। রাজবাড়িতে শোরগোল উঠল। রাজা সংবাদ পেলেন। জোলার প্রাণদণ্ড করলেন। এবং তার পরিবারবর্গ

নির্বাসিত হল। কিছুদিন পর ফকীর ফিরলেন। ফেরার পথে আবার এখানেই তিনি একদিনের জন্য বিশ্রামে মনস্থ করে গেলেন সেই জোলার বাড়ি। দেখলেন বাড়ির অস্তিত্বই নেই। অনুসন্ধানে সমস্ত তথ্য অবগত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরলেন। কিছুদিন পর সৈন্য সংগ্রহ করে ফিরে বাউড়ী রাজাকে ধ্বংস করে এখানে তাঁরাই রাজা হয়ে বসলেন।

এই প্রবাদ অনুযায়ী এই সময়েই দেবমূর্তিগুলিকে ভেঙে মাঠে পুকুরে নিক্ষেপ করেছিলেন তাঁরা।

জীবনে সেদিন ছিল একটি অপরিণত অপরিপক্ক ঐতিহাসিক কৌতূহল, তার সঙ্গে একটা কিছু আবিষ্কার করে বিখ্যাত হওয়ার গোপন আকাঙ্ক্ষা। চারিদিক ঘুরলাম। খোঁজও অনেক করলাম। দেখলাম ঠাকুরপাড়াকে বেষ্টন করে একটি গড়খাত বা পরিখা রয়েছে। তার কিছু কিছু অংশ মজে গিয়ে জমি হয়েছে কিন্তু অনেকটাই এখনও মজা খাল হয়েই রয়েছে। বর্ষার সময় জল জমে। বর্ষাও শেষ হয় জলও শুকিয়ে যায়। এবং একটি পুষ্করিণীতে দুটি কড়ির মত আকারের পাথরের কড়ি বা লিন্টেল আবিষ্কার করলাম। আরও একটি পেলাম ঠাকুরপাড়ার মসজিদের কোলে যে পুকুরটি তার ঘাটে। এটিকে কাপড় কাচবার পাথর হিসেবে ব্যবহার করে ওপাড়ার মেয়েরা। এবং যারা নামাজ পড়ে মসজিদে তারা 'ওজু' করে। সে বয়সে মনে হয়েছিল এ আবিষ্কার একটা মস্ত আবিষ্কার। আমাদের ওখানে একটি সাহিত্যসভা ছিল—সেই সভার মাসিক অধিবেশনে এ নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে বেশ আত্মপ্রসাদ এবং খ্যাতিও অর্জন করেছিলাম। তখন নাটক লেখার ঝোঁক ছিল। একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটকও ছকেছিলাম।

তারপর অবশ্য ভুলেই গিয়েছিলাম ঠাকুরপাড়া গড়খাই ভগ্ন দেবমূর্তি এবং বাউড়ী রাজার কথা। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মনে পড়েছে নানান সূত্রে। সব থেকে বেশী সাড়া জাগাত এঁদের এই ঠাকুর উপাধি এবং তাঁদের যোগচর্চার ঐতিহ্যের প্রবাদ। প্রথম যখন সেট্‌লমেন্ট হয় তখন একটা নতুন সন্দেহ বা প্রশ্ন জেগেছিল। সেটা এই যে এখানকার ভূমিস্বত্ব কোথা এবং কার কাছ থেকে কার কাছে এসেছে এর বিবরণ যখন সেট্‌লমেন্টের তাগিদে প্রাচীন কাগজপত্র থেকে উদ্ঘাটিত হল তখন দেখা গেল এখানকার বহু নানাকার নাখরাজ প্রভৃতির প্রাচীন অধিকারী ছিলেন ঠাকুরেরা, কিন্তু এখানকার ভুমির উপর ভূস্বামিত্ব বা রাজত্ব অধিকারের কোন সংস্পর্শ ছিল না। আরও একটি প্রশ্ন তখন মনে জেগেছিল—সে প্রশ্নটি এই যে মুসলমান অধ্যুষিত পাড়াগুলির মধ্যে একটিও হিন্দুর বাস নেই। এমন কি ব্রাত্য হিন্দুরও নেই। আগন্তুক অভিযানকারী হিসাবে মুসলমানেরা যেখানে যেখানে এসেছেন সেখানে জীবনধারণের ক্ষেত্রে সমাজে এমন কতকগুলি কর্মগত বৃত্তি আছে তা মুসলমানেরা গ্রহণ করেন নি—সেখানে তাঁরা এই হিন্দু ব্রাত্যদের দ্বারাই করিয়েছেন এবং সে সব স্থানে এরা ওই গ্রামের একটি অংশে বাস করে। এখানে তা নেই। প্রশ্নটা জেগেছিল মনে। কেন নেই?

এর বেশ কয়েক বছর পর—তখন আমি আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে সদ্য বাসা করেছি। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু আমাকে বাসা দেখে দিয়েছেন। নিজেও ওই বাড়ির দুখানি ঘরে থাকেন। কোন্ প্রসঙ্গে মনে নেই তিনি একটি ঘটনার কথা বললেন। উড়িষ্যার ঘটনা। উড়িষ্যার কয়েকখানি গ্রাম এমনি ষোল আনা মুসলমানের গ্রাম। সেখানে বহু নাখরাজভোগী মুসলমান একটি পরিবারের বাস। তাঁরা ওখানকার সকল মুসলমানের পূজ্য গুরুস্থানীয়। সেট্‌লমেন্টের সময় তাঁরা ওইসব নাখরাজের ছাড়পত্র হিসাবে একখানি তাম্রফলক বের করে দেখিয়ে বলেছিলেন—বাদশাহী ছাড়পত্র।

বলা বাহুল্য এই সব ধর্মগুরুরা প্রায় নিরক্ষরই ছিলেন। জানতেন কেবল উড়িয়াভাষা। আরবী হরফ পারসী ভাষা ছিল দুর্বোধ্য।

যে তাম্রফলকখানি তাঁরা বের করলেন দেখা গেল সেখানি দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা ব্রহ্মোত্তরের ছাড়পত্র। তাতে লেখা আছে—"আপনি একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত, শাস্ত্রচর্চা পুরুষানুক্রমে অব্যাহত রেখে দেবভাষা এবং ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেই কর্মের সম্মান হিসাবে এবং আপনার এই চর্চা নির্বাহের ব্যয় সংকুলানার্থ এই কয়েকখানি গ্রাম নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর হিসাবে প্রদত্ত হল।" দাতা উড়িষ্যার হিন্দু রাজা।

তখন অনুসন্ধান ও অনুমানে জানা গেল যে একসময় এই গুরুবংশ কোনক্রমে জাতিচ্যুত হয়ে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যসেবকেরাও তাঁর সঙ্গে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেছেন।

এই ঘটনার কথা শুনে আমার মনে চকিতে জেগে উঠেছিল ঠাকুরপাড়ার যোগচর্চাকারী ঠাকুর উপাধিধারী মিয়াদের কথা।

হিন্দু সমাজে পাতিত্যের অস্ত্রপ্রয়োগে পরস্পরের

প্রতি ঈর্ষাতুর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের এই ছিন্নমস্তা ধর্ম সুবিদিত। বাংলায় পিরালি ব্রাহ্মণ সৃষ্টির ইতিহাস তার সাক্ষ্য। তাঁরা পাতিত্য মাথায় করেও পিরালি ব্রাহ্মণই থেকে গিয়েছিলেন এটা বাংলার হিন্দু সমাজের পরম সৌভাগ্য—এ কথা ইতিহাসের।

যাক। এই ঘটনায় যে আলোর দিশাটি পেলাম সেই আলোয় ঠাকুরপাড়ার ঠাকুর মুসলমানদের নিয়ে একসময় অনেক জল্পনা এবং কল্পনা করেছিলাম এবং একখানি উপন্যাস রচনার চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু সফল হতে পারি নি। উপন্যাসখানি 'দ্বারমণ্ডল' নামে প্রকাশিত হয়েছিল ভারতবর্ষে। কিন্তু সফল হয় নি বলেই বইয়ের আকারে প্রকাশ করি নি।

সম্প্রতি এই রাঢ়বঙ্গের সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে এবং লোক-সংস্কৃতি ও লোকধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করছেন শ্রীমান বিনয় ঘোষ। তাতে আবার একটি নূতন আলোক পেলাম। এবং সম্প্রতি রাঢ়ে কন্নসুবন্ন বা কর্ণসুবর্ণ বর্তমানে রাঙামাটি প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে যে সব খননকার্য চলছে তাতে আর একটি আলোর শিখা পড়ল।

বাংলার রাঢ় অঞ্চলে—ধর্মদেবতা বা বুদ্ধার্চনার যে বিকৃত রূপ আজও গোটা সমাজের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে এই রাঢ়ে এবং নানাস্থানে বৌদ্ধস্তূপের যে সন্ধান মিলছে তাতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে রাঢ়ের এই অরণ্যময় অঞ্চল—মেদিনীপুর বাঁকুড়া বীরভূম উত্তর-পশ্চিম বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে যে লোক-সংস্কৃতি ছিল, যার সঙ্গে হিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল সে-কালে—যার ফলে ব্রাহ্মণেরা এই লোক-সংস্কৃতি ও লোকায়ত ধর্মের উচ্চস্তরে শাস্ত্র ও পৌরাহিত্যজীবী সম্প্রদায়কে পতিত করে অস্পৃশ্য করেছিলেন বলেই এঁরা মুসলমানদের আসার অব্যবহিত পরেই শিষ্যসেবকসহ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু গ্রহণ করেও দীর্ঘকাল এঁরা তাঁদের পূর্বকালের যোগচর্চা আচার প্রভৃতি পরিত্যাগ করতে পারেন নি।

মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু সম্প্রদায় আজও আছে যারা ধর্মে ইসলাম হয়েও আজও তাদের হিন্দু নাম হিন্দু আচার বজায় রেখেছে। বাংলার পটুয়া বাংলার বেদে শ্রেণী আজও বিদ্যমান। কলকাতায় 'নিকারী' যারা মৎসজীবী তাদের মধ্যেও এই ধারা বর্তমান। তাদের বিবাহ মুসলমান মতেও হয় আবার তার সঙ্গে হিন্দু বিবাহের গায়ে-হলুদ থেকে অনেক আচার তারা পালন করে।

এই সেদিন আমার গ্রামে মাঠের মাটির তলায় পাওয়া চামুণ্ডা মূর্তির সামনে বসে ছিলাম।

ঔপন্যাসিকের মন।

বললাম—তুমি চামুণ্ডা হও অথবা চণ্ডী হও অথবা বৌদ্ধ তারা হও অথবা মঞ্জুশ্রী হও—যে হও—বল—তুমি বল সেই দুশো বছরের আগের সেই কথা বল।

অনেকক্ষণ বসে ছিলাম চোখ বুঁজে।

যেন শুনলাম কানের কাছে কেউ মৃদুস্বরে বলছে—শোন তবে—''শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি—'' কি বললেন সে কাহিনী সুদীর্ঘ। সে একটি উপন্যাসের উপাদান। সেকাল হলে বলতাম—ঠাকুরানীমঙ্গল। এ কালে কি নাম দেব তাই ভাবছি।

ভাদ্র ১৩৭১

ছোটগল্প

পাগলীর হাসি

বনফুল

আমাদের মন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেক জিনিস সঞ্চয় করিয়া রাখে। সর্বদাই সে এ কাজ করিতেছে। তাহার এই সংগ্রহশালার নাম স্মৃতির ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে সংগ্রহের পদ্ধতিটি কিন্তু অদ্ভুত। তাহা কোনও সামাজিক বা সাংসারিক নিয়ম মানিয়া চলে না। সেখানে ধনীর পাশে দরিদ্র বা মহারাজার পাশে ভিখারীর ছবি মোটেই বেমানান নয়। হাসির পাশে অশ্রু, সবলের পাশে দুর্বল, গম্ভীরের পাশে অগম্ভীরের সমাবেশ সেখানে দুর্লভ নয়। সকলের মনের মধ্যেই এই বিচিত্র 'মিউজিয়ম' আছে। আমরা কিন্তু সর্বদা এ সম্বন্ধে সচেতন থাকি না। প্রায়ই দেখা যায় একটা অন্যমনস্কতার পরদা এই সংগ্রহশালার দ্বারে ঝোলানো আছে। মাঝে মাঝে কিন্তু পরদাটা কোনও প্রবল আবেগের হাওয়ায় উড়িয়া যায়, তখন হঠাৎ আমরা এই বিচিত্র সংগ্রহের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া যাই। হয়তো একটা ছবি, হয়তো একটা গানের কলি বা একটা অজানা ফুলের হঠাৎ-ভাসিয়া-আসা সৌরভ আমাদের আকুল করিয়া তোলে।

বিজয় ডাক্তারও সেদিন একটি হাসির দিকে চাহিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল—, কি মনে হইল তাহা পরে বলিব।

হাসিটি তিনি দেখিয়াছিলেন প্রথম যৌবনে। তখন তিনি চাকুরি করিতেন। সাঁওতাল পরগনার এক ডিস্‌পেন্সারিতে ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারখানার সামনে ভালো 'পীচ্'-বাঁধানো রাস্তা, সেই রাস্তার উপর বাস্ স্ট্যান্ড (bus stand) এবং সেই বাস্ স্ট্যান্ডকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি দোকান। চায়ের দোকান, খাবারের দোকান, একটি ছোটখাটো হোটেল, পান-বিড়ির দোকান, একটি মনিহারী দোকানও। যখন 'বাস্' আসিত তখন সেই দোকানগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ছোটখাটো একটা মেলা বসিয়া যাইত যেন। নানারকম লোক। হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, বিহারী, মাড়োয়ারী, সাঁওতাল, সব রকম লোকই আসিত। এই ভিড়ের মধ্যে ডাক্তারবাবু হঠাৎ একদিন সেই মেয়েটিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মতো চেহারা তাহার। সর্বাঙ্গে যৌবন প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। মুখে একটা মৃদু মুচকি হাসি। বড় বড় চোখ দুইটিতে প্রচ্ছন্ন কৌতুক। একপিঠ চুল। কখনও আলুলায়িত, কখনও খোঁপা-বাঁধা। খোঁপার উপর মাঝে মাঝে ফুলও থাকিত, কখনও পলাশ, কখনও জবা, কখনও বা আর কিছু। যখন ফুল জুটিত না, তখন গাছের সবুজ পাতাই সে খোঁপায় গুঁজিয়া দিত। পরনে আড়ময়লা ছেঁড়া শাড়ি, মাঝে মাঝে তালি-দেওয়া। কখনও ভালো শাড়িও পরিত, হঠাৎ দেখা যাইত ডগমগে রঙের একটা শৌখিন শাড়ি পরিয়া আছে। গায়ে কখনও জামা পরিত না, বুকের আঁচল সম্বন্ধেও খুব সচেতন থাকিত না সে, আঁচল বার বার খসিয়া যাইত, ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাহার। তাহার বাহিরে পোশাক মাঝে মাঝে বদলাইত বটে, কিন্তু তাহার মুখের হাসিটির কখনও পরিবর্তন হইত না। বিজন ডাক্তার যখনই তাহাকে দেখিতে পাইতেন দেখিতেন তাহার মুখের সেই মৃদু মুচকি হাসিটি এবং চোখের কৌতুকদীপ্তি ঠিক তেমনই আছে। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত—এই অনড় হাসির অর্থ কি। সকলে যে তাহার দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ইহা কি তাহারই প্রতিক্রিয়া? কিন্তু বিজনবাবু ও হাসিতে গর্বের কোন আভাস তো পাইতেন না। তবে কি উহা ব্যঙ্গর হাসি, না কৌতুকের। বিজনবাবু ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। আর একটা ব্যাপারেও তাঁহার খুব অবাক লাগিত। অমন রাজরানীর মতো চেহারা কিন্তু ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। লোকে নাম দিয়াছে পাগলী। কোন্ জেলার লোক ঠিক বোঝা যায় না। বাংলা কথা বলে, কিন্তু একটু বীরভূমি টান আছে, ক্রিয়াপদগুলি শুদ্ধ। অনেকে বলে ও জাতে বাউরি, কিন্তু রং কালো নয়, রং বেশ ফরসা। অনেকের মতে ওর মা নাকি এক সাহেবের রক্ষিতা ছিল। মোটকথা তাহার আসল পরিচয় কেহ জানিত না। মাঝে মাঝে সে বিজন ডাক্তারের বাড়িতে আসিয়াও হানা দিত। বিজনবাবুর স্ত্রীর কাছে গিয়া বলিত, ''মাইজি, খাইতে দে, দু'দিন কিছু খাই নাই।''

বিজনবাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিতেন, ''ভিক্ষে করে' পয়সা পাস, দু'দিন অনাহারে আছিস?''

''পয়সা পাই তো। এই যে! এইগুলো কিন্‌লোম।''

কাপড়ের আঁচল হইতে প্ল্যাস্টিকের তৈরি কয়েকটা মাথার ফুল আর একগোছা রঙীন চুলের কাঁটা বাহির করিল। মুখে সেই মৃদু মুচকি হাসি। ডাক্তারবাবুর স্ত্রীও হাসিয়া ফেলিলেন।

''না খেয়ে এই সব কিনেছিস? পাগলী সাধে বলে!''

পাগলীর চোখের কৌতুকদৃষ্টি আরও চিকমিক করিয়া উঠিল।

ইহার কিছুদিন পরে যাহা প্রত্যাশিত তাহাই ঘটিল। সকলেই বুঝিতে পারিল যে পাগলী অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গে আসন্ন মাতৃত্বের চিহ্ন পরিস্ফুট। সবাই ইহা লইয়া হাসি-তামাশা করিত। কোথাও খানিকটা বিষ্ঠা বা কফ পড়িয়া থাকিলে যেমন মাছি ভনভন করে তেমনি অশ্লীলতাগন্ধী কিছু একটা পাইলে তথাকথিত রসিকেরও অভাব হয় না। পাগলীকে দেখিলেই অনেকে ভুরু নাচাইয়া প্রশ্ন করিত তাহার নাগরটি কে, কোথায় থাকে। পাগলী কোন জবাব দিত না, রাগও করিত না। মুখে মৃদু মুচকি হাসিটি ফুটাইয়া চুপ করিয়া থাকিত। সকলের নিকট ভিক্ষার জন্য হাত পাতিত যেন কিছুই হয় নাই। তাহার চরিত্রের এই নূতন দিকটার পরিচয় পাইয়া দাতার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল মনে হয়। কারণ রোজ প্রায় এক টাকা রোজগার করিত সে।

একদিন আবার সে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আসিয়া হাজির হইল।

''মাইজি, খাইতে দে। দু'দিন কিছু খাই নাই।''

''মুখপুড়ি, তোর লজ্জা করে না? এতো পয়সা পাস কি করিস তা দিয়ে?''

''পয়সা পাই তো, এইগুলো কিন্‌লোম।''

পেটকাপড় হইতে কয়েকটা ছোট ছোট জামা, একজোড়া ছোট মোজা এবং একটা ছোট টুপি বাহির করিয়া হাসিমুখে চাহিয়া রহিল। ডাক্তার-গৃহিণী ভাবিয়াছিলেন তাহাকে খুব বকিবেন, কিন্তু তাহার মুখের মৃদু মুচকি হাসির দিকে চাহিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। রান্নাঘরে বাসী ভাত ছিল তাহাই বাহির করিয়া দিলেন। পাগলী বেশ খাইতে পারিত। সামান্য ডাল ও তরকারি দিয়া অনেগুলি ভাত খাইয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল, ''পেট ভরে নাই। আরও দাও।''

''আবার কি দেব? আর কিছু নেই। যা এখন।''

''ওই শশাটা দাও।''

তরকারির ঝুড়িতে একটা শশা ছিল। পাগলী সেইটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দিতেই হইল শশাটা। বাঁ হাতে শশাটা ধরিয়া কামড়াইয়া খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতেই চলিয়া গেল। ডাক্তার-গৃহিণীর রাগ করা উচিত ছিল, কিন্তু রাগ করিতে পারিলেন না।

কিছুদিন পরেই আবার প্রত্যাশিত দৃশ্যটি দেখা গেল। একটা সদ্যোজাত শিশুকে বগলদাবা করিয়া পাগলী বাস্‌ স্ট্যান্ডে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। শিশুর গায়ে নতুন জামা, পায়ে নতুন মোজা, মাথায় নূতন টুপি। তবু তারস্বরে চীৎকার করিতেছে সে। কিছুতেই যেন স্বস্তি পাইতেছে না। সকলের সামনে বুকের কাপড় খুলিয়া পাগলী তাহাকে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তবু তাহার কান্না থামিতেছে না। এজন্য কিন্তু পাগলীর মুখে কোনও বিরক্তি, আশঙ্কা বা বিব্রতভাব ফুটিয়া উঠিল না। ইহা লইয়া অনেকে বিদ্রূপব্যঙ্গও করিল, কিন্তু পাগলীর মুখের মুচকি হাসিতে কোনও পরিবর্তন ঘটিল না। সে মুখের মুচকি হাসি বজায় রাখিয়াই তাহার রুদ্যমান সন্তানকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ডাক্তার-গৃহিণী একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, ''তুই ছেলেটাকে মেরে ফেলবি দেখছি। আমাকে দে, আমি ওকে মানুষ করি।''

তাঁহার কোলে তখনও কোনও সন্তান আসে নাই। বীরেনের জন্ম হইয়াছিল অনেক পরে।

একথা শুনিয়া পাগলী ডাক্তার-গৃহিণীর দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের মুচকি হাসিতে আর এক ঝলক আলো আসিয়া পড়িল যেন। ধীর শান্ত কণ্ঠে সে উত্তর দিল—''না, দিব না।''

কিছুদিন পরে দেখা গেল পাগলীর কোলে শিশুটি নাই। কিন্তু তাহার মুখের মৃদু মুচকি হাসিটি ঠিক আছে।

ডাক্তার-গৃহিণী একদিন ডাকিলেন তাহাকে।

''তোর খোকা কোথা?''

''থাকল না, চলে' গেল, মরে' গেল।''

তাহার মুখের মৃদু হাসিটির দিকে চাহিয়া বিজন ডাক্তার অবাক হইয়া গেলেন। শোকের ছায়া সে হাসিকে একটুও ম্লান করে নাই।

ইহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। প্রায় দশ বৎসর। অনেক ঠাকুরের নিকট অনেক আরাধনা করিয়া ডাক্তার-গৃহিণীর কোলে বীরেন আসিয়াছিল। সে-ও বেশিদিন রহিল না। হঠাৎ একদিন মারা গেল। বিজন ডাক্তার শোকাচ্ছন্ন হইয়া ছাতের উপর চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। সহসা শোকাবেগে তাঁহার মনের সংগ্রহশালার পরদাটা উড়িয়া গেল। তিনি সেই পাগলীকে দেখিতে পাইলেন, মৃদু মুচকি হাসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

বিজন ডাক্তারের সহসা মনে হইল নিষ্ঠুর নিয়তিকে অগ্রাহ্য করিয়া আমিও যদি অমনি হাসি হাসিতে পারিতাম।

মাঘ ১৩৭০

ছোটগল্প

বসন্তের দাগ

দিব্যেন্দু পালিত

পুরোনো আলমারির গায়ে একটা আয়না লাগানো আছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে শ্যামলী ভাবল, সামনের মাসে সে পঁয়ত্রিশ পেরুবে। সাধারণতঃ ওই বয়সের পর মেয়েদের সন্তান ধারণের ক্ষমতা কমে আসে।

পাল্লার একদিকে ক্ষয়া কাঠ, অন্যদিকে বয়স মাপা আয়নাটা। বাবার যৌবনে এইটেই ছিল ফ্যাশন। সে আরো ছত্রিশ বছর আগেকার কথা। এতগুলো বছরে পর পর অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে। বাবার মৃত্যু, মা'র চোখে ছানি পড়া, পর পর দু'বোনের বিয়ে হওয়া, বিয়ে করে এক ভাইয়ের আলাদা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। বাকী থাকে আরো একটি বোন ও দুটি ভাই। ছোটটির বয়স সাত। অন্ততঃ আরো একটি বছর আগে বাবা মরলে সে জন্মাবার সুযোগ পেত না। ওরা তাকে ভালবাসে কিনা জানা নেই, কিন্তু তার ওপর নির্ভর করে। বাবা-মা'র প্রথম দাপটের সন্তান বলে শ্যামলীর কাঁধ চওড়া স্মৃতি বেশ প্রখর।

তবু রোজই অফিসে বেরুনোর আগে আলমারির সামনে এসে দাঁড়ালে মেজাজ খিঁচড়ে যায়। ফাঁকা মাঠের মধ্যে একা ঠায় দাঁড়িয়ে-থাকা তেঁতুল গাছের ডালপালা জুড়ে বাদুড়েরা ঝুলে থাকে। আশেপাশে কিছু ও কেউ নেই বলেই বিপত্তি। না হলে চমৎকার ঝেড়ে ফেলা যেত। এখন, দিনের পর দিন ধরে শ্যামলীর মনে হয় অসম্ভব—দেয়ালে টিপে-মারা ছারপোকার শুকনো রক্তের মতো তারও অস্তিত্ব জুড়ে ছাপ পড়ে গেছে। অসম্ভব বলেই সারাক্ষণ মাথার ভিতর ভোঁ ভোঁ করে অন্ধকার। যে-শ্যামলীর চটপট একটা যে-কোন শাড়ি বের করে পরে সাড়ে ন'টার ট্রাম ধরার কথা, সে চায় সায়া-ব্লাউজ না পরেই বেরিয়ে পড়তে রাস্তায়; ছুটতে, ধ্বংস হতে।

কিন্তু আজ অন্যদিন। আজকের দিনটা শুরু হয়েছে বাজার-চালু লেখকের গল্পের নায়িকার ধরনে। আজ সে মানানসইভাবে ধরে রাখতে চায় নিজেকে।

সকাল থেকেই এই মুহূর্তটির জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল শ্যামলী। বলতে গেলে কাল রাত থেকেই। গভীর যন্ত্রণার রাত গেছে কাল। ঘুম এলো না, বিছানা জুড়ে ছটফট করল সারাক্ষণ; তার পরেও ঘুম এলো না। কান ও গালের মাঝামাছি যে-জায়গাটা প্রায়ই তার অত্যন্ত কর্কশ মনে হয়—কোন্ জাদুবলে সেখানে ফিরে এলো কোমলতা, ঠোঁটের শব্দ। পঁয়ত্রিশ বছরের অকাতর শরীর ভুল রাস্তায় পৌঁছুনো শিশুর মতো চিৎকার করে উঠল।

বাঁচল ভোর হতে। চমৎকারভাবে নিরীহ হতে থাকল শ্যামলী, এবং কোমল। অনেকদিন সে এইভাবে ভোর হতে দেখেনি। এটা দুঃখ না আনন্দ, আশা না বিপর্যয়, কিছুই স্পষ্ট করে ধরা ছিল না মাথায়। তারপর অফিসে যাবার সময় হতেই শুরু হয়ে গেল সমস্যা।

প্রথম সমস্যা আয়নাটা। নিজের সঙ্গে দেখাদেখি হতেই শ্যামলী বুঝতে পারল। সে সুন্দরী নয়। রং কালো; মুখের ডৌল, বসন্তের দাগগুলো বাদ দিলে, চালিয়ে দেওয়া যেত। নাক চাপা, ঠোঁট পুরু, কপালও কি একটু বেশি চওড়া নয়? এইসব খুঁতগুলো ধরা পড়েনি এতদিন। আজ পড়ল। আজ সে সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে বেরিয়েছিল।

দুঃখিত হাতে আস্তে আস্তে আলমারিটা খুলে ফেলল শ্যামলী। এবং ভাবতে শুরু করল, এই খুঁতগুলো কোন খুঁত নয়। এগুলো পুষিয়ে দেবার মতো নিশ্চিত বাড়তি কিছু আছে তার। মনের দামে এগুলো কেনা যায় না। তাছাড়া, যৌবনের দামও তো কম নয়। এইমাত্র আলমারি খুলতে গিয়ে মুখ ছাড়াও শরীরের আর-আর অংশগুলো লক্ষ্য করেছে সে। অযত্নে নিস্পৃহতার মধ্যে বেড়ে উঠেছে বলেই এখনো শরীর বুনো ফলের মতো তরতাজা ভাবটা হারায়নি।

কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে রঙ পছন্দের জন্যে শাড়ির পর শাড়ি হাতড়াতে শুরু করল শ্যামলী।

হালকা সবুজ রং তার খুব পছন্দ। কিন্তু কালোর সঙ্গে সবুজ ঠিক খাপ খাচ্ছে না। আজ সে একটু অন্যরকম হতে চায়। অন্যরকম, মানে রমেনের পছন্দমতো। রমেন আজ তাকে দিয়ে কথা বলাবে; সেইসব কথা, আভাসে, ইঙ্গিতে, গত কিছুদিন ধরে যে কথা রমেন নিজেই বলার

চেষ্টা করেছে। তারপর কাল হঠাৎ বাঁধার আগে ঘটনাটা কেমন খাপছাড়া হয়ে গেল—

'আপনার কখনো খাপছাড়া লাগে?'

'কী!'

'জীবনটা? মানে, এই ঘুরে বেড়ানো, কথা বলা, বার বার একই লোকের সঙ্গে—' মাঝখানে ট্রাম এসে পড়ায় রমেন একটু থামল। ট্রাম চলে যাবার পর পাশাপাশি লাইন পেরিয়ে ফুটপাথে উঠতে উঠতে বলল, 'অবশ্য একই লোকের সঙ্গে কিনা আমি ঠিক বলতে পারব না—'

শ্যামলী রমেনকে দেখল এবং আড়চোখে তাকানোর ব্যাপারটা তখনই বুঝতে পারল। কথাগুলো যদিও তেমন বুঝল না। ছুটির পর এইভাবে হাঁটাটা ইদানীং তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। অভ্যাসের সঙ্গে রমেনও জড়িয়ে গেছে ভাবেনি।

না কি ভেবেছিল! সন্দেহ দেখা দেওয়ায় সে হাসতে সময় নিল।

'রাস্তায় এতো লোকজন, তবু একই লোকের সঙ্গে। কথাটার মানে কী!'

'লোকজন হাঁটে, থাকে, মিলিয়ে যায়। জি.পি.ও. থেকে কার্জন পার্ক পর্যন্ত হেঁটে এলাম। ক'জনের মুখ মনে আছে—'

শ্যামলী ইতিমধ্যেই কাঁপতে শুরু করেছিল। মনের প্রস্তুতি গাছের পাতা নড়ে ওঠার মতো, সে পরিষ্কার বুঝতে পারে। ইতিমধ্যে একদিন রমেনকে জড়িয়ে স্বপ্ন দেখেছে। পাশাপাশি এটাও সে ঠিক বুঝতে পারে না—রমেন আর সে শুধু এক অফিসে কাজ করে, পরিচয় বেশি হয়ে যাওয়ায় এইরকম ঘুরে বেড়ায়, না আরো বিশেষ হয়ে তারা জড়িয়ে যাচ্ছে!

'লোকের মুখের দিকে তো তাকাই না। রাস্তা দেখি। এদিক-ওদিক তাকালেই তো বিপদ; কখন ট্রাম-বাস ঘাড়ে এসে পড়বে!'

এটা রমেনের কথার উত্তর নয়। নিছক এড়িয়ে যাওয়া। রমেন হয়তো বয়সে সমান কিংবা কিছু বেশীই হবে; কিন্তু, শ্যামলীও পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে যাচ্ছে। চেনাশোনার মধ্যে রমা তার তৃতীয় সন্তানের জন্ম দেবে দু'এক মাসের মধ্যে, শ্রীলেখা তার মেয়ের জন্যে এখন থেকেই পাত্র খুঁজতে শুরু করেছে। পঁয়ত্রিশ মানেই তো দু' তিনটে ফসল তোলা জমি! এরপর হয়তো কিছু হবে, হয়তো হবে না। শ্যামলী খুশী হতে পারে না।

আরো অনেকক্ষণ ওরা চুপচাপ হাঁটল। রেড রোড পেরিয়ে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ছাড়িয়ে হাসপাতালের রাস্তায় পড়ল। এইখানে ছাড়াছাড়ি হবার কথা—যেমন প্রায়ই হয়, অবশ্য যেদিন অন্যদিকে না যায়। এতোটা হেঁটে আসায় ক্লান্তি আছে। তবু ভালো লাগে শ্যামলীর। এতোদিন এই ভালো লাগাটাকে সে দেখছিল ঘুমের ওষুধ হিসেবে। মাসের গোড়ায় সংসার খরচের টাকা পেলেই মা'র অর্ধেক ছানিপড়া চোখে কিছুটা আলো ফুটে ওঠে।

রমেন উত্তরে যায়, কলেজ স্ট্রীটের কোন একটা মেসে থাকে। শ্যামলী দক্ষিণে যায়—এই সময় ট্রামে চড়লে বসার জায়গা পায়। ছাড়াছাড়ি হবার আগে শ্যামলীর হঠাৎ এই ব্যাপারটা খেয়াল হলো। অনেক দিন থেকেই তারা হাঁটছে একসঙ্গে; কিন্তু যাচ্ছে দু'দিকে।

শ্যামলীর শাড়ি নির্বাচন শেষ পর্যন্ত ঢিলেঢালা হয়ে থাকে; ভাবে, বিশিষ্ট হওয়ার দরকার কী! এর মধ্যে সত্যিই কি কিছু আছে যাকে বলা যাবে নতুনত্ব—ঝড়, বা হৃদয়ের হঠাৎ পরিবর্তন!

খুব সাদামাটা হয়ে ট্রামে ওঠে শ্যামলী। দূরত্বের যতো কাছাকাছি পৌঁছয়, ততোই একটা 'যদি' তাকে ক্রমাগত কীটদষ্ট করে। যদি এমন হয় বা যদি তেমন—যদি হঠাৎ লাইনচ্যুত ট্রামের মতো কাল সন্ধ্যাবেলায় যা ঘটল তা শুধুই অনিয়মিত ঘটনা হয়ে থাকে! এটা ঠিক, উত্তরে ও দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন হবার আগে প্রবল আবেগে নড়ে উঠেছিল সে—শারীরিক কারণে যতোটা নয় তার চেয়ে বেশী রমেনের এলোমেলো কথার জবাব দিতে পারেনি বলে। আর তখনই রমেন হাত উঁচিয়ে ট্যাক্সি ডেকেছিল, 'তোমাকে আজ বাড়ি পৌঁছে দেবো।'

তোমাকে! অস্পষ্টতা থেকে সরাসরি স্পষ্টতায় চলে এলো রমেন।

শ্যামলী তখন পুরো বিষয়টিকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছে এবং ভাবছে, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে রমেন ট্যাক্সি ডেকেছিল, না হলে এরকম একা করে সে নিজেকে ছুঁতে পারত না, ডুবতে পারত না নিজের মধ্যে! একটা অকেজো বাতি অনেকদিন পরে জ্বলে উঠল।

ট্রাম থেকে নামল শ্যামলী। মাথার ওপর তীব্র রোদ ও আশেপাশের লোকজন ট্রাম বাস মোটর ইত্যাদির ব্যস্ততাময় শব্দ তাকে আলাদা করে রাখল। দুর্ধর্ষ কলকাতার

বিভিন্নতার মধ্যে, পারিবারিক দায়িত্ব ও কলুষ থেকে দূরে, একা ও গোটা হয়ে সে অফিসে পৌঁছুলো, বসল নিজের জায়গায়, সাবলীল ব্যবহার করল সকলের সঙ্গে, অপ্রয়োজনে একটি কথাও বলল না, এবং মাঝে মাঝে তাকাতে থাকল দেয়ালের ঘড়িটার দিকে। তার কবজিতেও একটা ঘড়ি আছে; নাড়ীর স্পন্দন অসম্ভব দ্রুত হওয়ার ফলে আজ সেটাকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।

সুবিধে এইটুকু, ছুটির আগে রমেনের সঙ্গে দেখা হবে না। রমেন আজ অফিসে আসছে না। এই খবরটা পাবার সময় কেন আসবে না তা নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থা ছিল না শ্যামলীর। শুধু এইটুকু জেনেছিল, হাঁসের মতো থুপথুপে পায়ে দিনের পর দিন এঁদো ডোবা পেরুনো নয়, পরিষ্কার রাস্তায় বুক টান করে একসঙ্গে হাঁটা যায় কিনা—রমেন সাফসুফ তা জেনে নিতে চায়। নিছক অর্থহীনতা চাপা দিয়ে, পরিচয়ের বিষ মিশিয়ে, এইভাবে দিনের পর দিন এগুনো যায় না।

এটাকেই ভালোবাসা বলে ভাবতে ভালো লাগছে। অনুপস্থিতি থেকেই রমেনকে মনে হচ্ছে পৃথিবীর আদিতম ও একমাত্র পুরুষ। এর বেশি তল খুঁজতে শ্যামলী অক্ষম। পঁয়ত্রিশের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথম শাড়ি-পরা বয়সটাকে এখন আর সে মনে করতে পারে না।

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই ক্রমশ কাহিল হয়ে পড়ল শ্যামলী। চওড়া কাঁধের ওপর ভরকরা চোখে ছানিপড়া মা ও আরো তিনজনের কথা সে আপাততঃ ভাবছে না। রমেন এ-সব জানে না তা নয়। জানে বলেই শ্যামলীর কাছে নানাভাবে সে আরো স্পষ্ট হতে চেয়েছিল।

'যাদের জন্য আজ এতো ভাবনা, কাল তারা বড়ো হবে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যে যার নিজের মতো করে চলবে। তুমি তখন কোথায় দাঁড়াবে!'

শ্যামলীর বয়স্ক ও ভারী মাথাটা তখনো রমেনের কাঁধে। স্পর্শকাতরতার তীব্র আকর্ষণ থেকে তখনো সে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। আলো ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ট্যাক্সিটা কোথায় চলেছে সে সম্পর্কে দুজনেই নীরব। হঠাৎ থেমে পড়ার ভয়াবহতাই তখন শ্যামলীকে ছিঁড়ছে বেশী।

রমেনের কথার তাৎপর্য ঠিক ঠিক মাথায় ঢুকছিল না। ক্লান্তি অপনোদনের বিরলতম সুযোগের মধ্যে একটু খেলো গলাতেই বলেছিল, 'দশ বছর আগে এ-কথা ভাবলে মানে হতো। এখন আর ভেবে লাভ কি!'

'কথাটা লাভ-ক্ষতির নয়। দশ বছর পরে আবার হয়তো তুমি এই কথাই ভাববে। তখনই বা কি লাভ হবে! ঘর পুড়ে গেলে চাল ছাওয়ার কথা কারুর মনে পড়ে না। সবাই তখন আশ্রয়ের কথা ভাবে।'

উত্তরে কি বলেছিল এখন আর ঠিক মনে নেই। শুধু মনে হয়েছিল রমেন একটা ঘর, যার মাথার উপর ছাদ আছে। আশ্রয় বলতে রমেন নিজেকেই বোঝাচ্ছে। তার উচিত রমেনের বাড়ানো হাত ধরে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া।

কিন্তু শ্যামলী কীভাবে রমেনের আশ্রয় হবে! একা হলেও রমেন উপার্জনক্ষম এবং পুরুষ—শ্যামলী কী করে তার আশ্রয় হবে? আশ্রয় সম্পর্কে রমেনের ধারণা নিছক তার প্রতি করুণা নয় তো? একে ভালোবাসা বলা যায়। কিন্তু, ভালোবাসার বয়স কি শ্যামলী পেরিয়ে যায়নি! বা আকর্ষণ করার মতো কী আছে তার মধ্যে! শরীর? সকালে বেরুবার আগে সেইরকম একটা সান্ত্বনা পেয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে পঁয়ত্রিশে এসে শুধু শরীরের খুঁটি গেড়ে ঘর তোলা যায় না।

এক প্রশ্ন থেকে আর এক প্রশ্নের ভিতর দিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকে শ্যামলী। প্রত্যেকটি ঘরই এখন দেখতে একইরকম লাগে। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে সে রমেনকে খুঁজতে লাগল, প্রত্যেকটি ঘরেই তাকে ডাকতে লাগল নিজের মতো করে। এর সবগুলিতেই রমেন আছে। শ্যামলী কোন স্থির বিন্দু খুঁজে পেল না।

এইভাবে দুপুর গড়ালো। বিকেল হল। ঘড়ির সময় গুনে লোকজন বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। শ্যামলী একা হল। ছায়া পড়তে শুরু করল। তখন সে উঠল। রাস্তা। কলকাতা যেমন-কে-তেমন তার ব্যস্ততা, মানুষজন, ট্রাম-বাসও শব্দ নিয়ে ছুটে এলো। কিন্তু, আজ সে নিরপেক্ষ থাকতে পারল না। স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মেয়ে বা পুরুষ, প্রতিটি মুখই সে লক্ষ্য করল; প্রতিটি মুখই মনে হল অপরিচিত। এবং হঠাৎ অনুভব করল শ্যামলী, প্রতিদিনের অভ্যাস এতদিনে তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। রমেনের অভাব এমন করে এর আগে কখনো সে অনুভব করেনি।

হাঁটতে হাঁটতে, অন্যমনস্কতার ভিতর, অনেক দূর চলে এসেছিল শ্যামলী। দূর থেকেই দেখল রমেন ঠিক দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায়। যা বলার এইবার তাকে বলতে

হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক কোন্ কথাটি বলা উচিত, কী বললে গতকাল রাত থেকে আজ এই পর্যন্ত সে যা ভেবেছে ঠিক প্রকাশ করা হবে, বুঝতে পারল না। রমেন হয়তো চায় তাকে, কিন্তু, কেন চায়, এ-প্রশ্নের দ্বিধা স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া চটির মতো তাকে স্বাভাবিক হতে দিল না।

শ্যামলী জানে, তার এই মুহূর্তের মানসিকতার সঙ্গে রমেনের কোন সংযোগ নেই। রমেনের ভাবনার বৃত্ত মোটা দাগে টানা। সুতরাং, রমেনের গাল-ছড়ানো হাসির উত্তরে সে যদি নীরবে হাসে—রমেন সেটাকে সম্মতি বলেই ধরে নেবে। তা ছাড়া শ্যামলী খুকী নয়; ঠিক সময়ে অপেক্ষমান রমেনের কাছে ওর চলে আসাই কি যথেষ্ট নয়।

শ্যামলী কিছুটা বিমূঢ় বোধ করল। প্রশ্নগুলো সবই তার নিজের সৃষ্টি। রমেন যে-ভাবে এইসব কথা ভাবছে বলে তার মনে হচ্ছে, তার নিজের ভাবনাগুলো বইছে স্পষ্ট তার উলটো খাতে। রমেনকে এখন খুব প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে, যেন শ্যামলীকে তার সম্পূর্ণ পাওয়া হয়ে গেল!

যতো ভাবল, ততোই ম্লান হতে শুরু করল শ্যামলী। বরং এখন বেশী করে তার মনে হতে লাগল, দীর্ঘদিনের রোদে জলে পড়ে হেজে থাকা কাঠ থেকে এত সহজে রস বের করা যায় না। নিজের কাছে নিজের ছবিটা এখানে এইরকম। রমেন কি ইচ্ছেমতো এবং এমন দ্রুত তাকে রূপ দিতে পারে!

হয়তো পারে। নিজের সম্পর্কে যতোই সংশয় থাক, শ্যামলী তা প্রকাশ করতে পারল না। হঠাৎই তার মনে হতে লাগল এই রমেন তার পরিচিত নয়। যে-অভাববোধ ও শূন্যতা নিয়ে সে এখানে ছুটে এসেছে, তার মূলে রমেনের জন্যে আকাঙ্ক্ষা নেই। একটি সন্ধ্যার স্পর্শ ও ইঙ্গিতই কি নিজেকে সমর্পণের শেষ শর্ত! প্রশ্ন কি শুধু রমেনেরই ছিল! তার ছিল না!

শ্যামলী ভাবতে লাগল। কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পেল না।

সন্ধে হল। আজ ও আগের দিনগুলোর মধ্যে পুরু তফাতের দাগ টেনে ওরা এগোতে লাগল, রেস্টুরেন্টে ঢুকল, খেলো। কলকাতার সাবলীল ভঙ্গিতে কোন পরিবর্তন দেখা দিল না। দূরত্বময় রমেনের খুব কাছে থেকে অসহায়ভাবে রমেনের যাবতীয় ইচ্ছের মধ্যে মিশে যেতে থাকল শ্যামলী। রমেন ট্যাক্সি ডাকল। শ্যামলী উঠল। ইচ্ছে না অনিচ্ছে কিছুই তাকে বিশেষভাবে টানতে পারল না। অনুভূতির মধ্যে এখন শুধু অন্ধকার ঠাসা। যেন সে বসে আছে কানে রিসিভার লাগিয়ে, অপেক্ষায়। অন্যদিকে দীর্ঘ ও অর্থহীন ক্রিং-ক্রিং শব্দ বেজে চলেছে!

এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে ট্যাক্সিটা অবশেষে একটা বাড়ির সামনে এসে থামল। অপরিচিত রাস্তা। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে রমেন ডাকলো, 'এসো—'

সামনের সিঁড়ির পর সিঁড়ি; রমেনের পিছনে পিছনে উঠে এলো ওপরে। আবছা করিডোর পেরিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল রমেন। পকেট থেকে চাবি বের করে দরজার তালা খুলল, 'এসো—।' রমেনের মুখে আলগা হাসি। শ্যামলী ভিতরে ঢোকার পর দরজাটা বন্ধ করে দিল আবার। তারপর ঘন চোখে শ্যামলীর মুখের দিকে তাকিয়ে তৎপর হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিল ওকে।

শ্যামলী বুঝল, রমেন কী চায়। রমেনের শরীরে আশ্লিষ্ট হবার আগে ও শুধু একবার নিজেকে জিজ্ঞেস করল, 'কি করবো? ফিরে যাবো?'

আর তখনই সমস্ত ঘোর কেটে গিয়ে শ্যামলীর হঠাৎ মনে পড়ল, তার রঙ কালো, মুখে বসন্তের দাগ, নাক চাপা ও ঠোঁট পুরু; এবং সামনের মাসে পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে যাবে। এই পর্যন্ত এসে রমেনকে প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হবে না।

বৈশাখ ১৩৮০

অঙ্কফল

আশাপূর্ণা দেবী

মেয়েরা এত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায় কেন? নন্দা কেন এমন বুড়িয়ে গেল? আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে কথাটা আর একবার নতুন করে ভাবলো রঞ্জন। রোজই যেটা ভাবে।

কী বিশ্রী রকম বুড়িয়ে গেছে নন্দা!

নন্দা! সুনন্দা! সেই চটপটে ঝরঝরে মেয়ে! এখন একেবারে একটা গিন্নী যেন! কথাটা তুললেও লজ্জার বালাই মাত্র দেখা যায় না ওর। দিব্যি হিহি করে হেসে বলে, ''শোন কথা! বয়েস হচ্ছে আর বুড়ো হল না? দিন কি বসে থাকবে?''

রঞ্জন বিরক্ত হয়ে বলে, ''দিনকে বসিয়ে রাখবার মন্ত্র জানতে হয় নন্দা, ওটা একটা আর্ট! দিনের হাতে একেবারে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে বসে বসে শুধু 'শেষের সেই দিনের' দিন গুনবো এ বাঁচা বাঁচা নয়, মরা।''

তা' এমনি স্বভাব নন্দার, রাগতে ও জানে না। এহেন অপমানকর কথাতেও রাগে না। বরং হাসির মাত্রাটা আরও বাড়ায়, ''তা তুমি যদি বাপু চিরতরুণটি থেকে যাও, আমি তার সঙ্গে তাল দিই কি করে? সেকাল হলেও না হয় দেখে-শুনে একটি সুন্দরী তরুণী যোগাড় করে তোমার একটা বিয়ে দিয়ে পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাতাম।''

হ্যাঁ, নন্দার রসিকতাগুলোও ক্রমশঃ ওর চেহারার মতই স্থূল হয়ে যাচ্ছে। শুনলে বিরক্তিতে গা বিষিয়ে ওঠে। নন্দার ওই মোটা রসিকতার সঙ্গে গড়িয়ে পড়া হাসির দাপটে মুটিয়ে যাওয়া দেহটা দুলে ওঠে, ভারী গালের আশেপাশে খাঁজ পড়ে, আর রঞ্জন রায় সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একদার বি.এ. ক্লাসের ছাত্রী সুনন্দা সেনকে আবিষ্কার করবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বিরক্তিবিকৃত মুখে সরে যায়।

অথচ সেই সুনন্দা সেনকে সুনন্দা রায় করে নেবার জন্যে কতগুলো দিন কী উন্মাদনাতেই কেটেছে রঞ্জন রায়ের!

সেই রঞ্জন রায় তো আজও আছে প্রায় তেমনিই। এই তো আরশির মধ্যে পড়া নিত্য ব্যায়ামে মজবুত দেহটার ছায়া, আর ওই দেয়ালে ঝোলানো এম.এ. ক্লাসের ছাত্র রঞ্জন রায়ের ক্যামেরায় ধরা দেহছায়া, দুটোর কতটুকু তফাত? কতটুকু বদলেছে রঞ্জন?

অথচ নন্দা?

ওর ছাত্রীবেলায় ছবিটা যেটা বিয়ের আগে রঞ্জনকে উপহার দিয়েছিল, সে ছবিটা যেন টেবিলের ওপর থেকে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গহাসি হাসে! রাগ করে ওটাকে একদিন টেবিল থেকে সরিয়ে ড্রয়ারে পুরে রেখেছে রঞ্জন।

তা' সরিয়ে যে রেখেছে, তাই কি নন্দার চোখে পড়েছে, না খেয়ালে এসেছে? রঞ্জন ভেবেছিল এই ছবি সরিয়ে ফেলা নিয়ে নন্দা যখন প্রশ্ন তুলবে, তখন রঞ্জন একবার আশ মিটিয়ে মনের উষ্মা প্রকাশ করে নেবে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে নন্দাকে, কি ছিল সে, আর কি হয়ে গেছে।

কিন্তু দিনের পর দিন গেল, নন্দা ওর ছবির কথা তুললোই না। অর্থাৎ বোঝা গেল টেবিলের ওই শূন্যস্থানটা তার মনের কোনখানে শূন্যতার সৃষ্টি করতে পারেনি।

শুধু আকৃতিতেই নয়, প্রকৃতিতেও আকাশপাতাল বদলে দেছে নন্দা। বিশ্রী রকমের বুড়িয়ে গেছে।

পাশের ঘর থেকে হি হি করে হাসির শব্দ এল!

নন্দারই হাসি, কোনো প্রতিবেশিনী বান্ধবীর সঙ্গে আড্ডা জমানো হয়েছে বোধহয়। স্ফূর্তির কোনো অভাব নেই! এ ঘর থেকেই চোখে না দেখেও নন্দার ওই আহ্লাদে আটখানা মূর্তিটা কল্পনা করতে পারলো রঞ্জন। ফর্সা ধবধবে মুখটা, যেটা ইদানীং গঠনভঙ্গীতে প্রায় ডাবরের মত হয়ে উঠেছে, সেই মুখটা নিশ্চয়ই এখন প্রসাধনের বালাই বর্জিত তেলতেলে মত, স্নানের পর কপালে যে সিঁদুরটিপটি এঁকেছিল সে টিপ এখন সারা কপালে ছড়িয়ে পড়ে আছে, বিকেলে আবার স্নানের আগে ওর এই কপালের কপালে আর কোনো সংস্কার জুটবে এ আশা নেই। এলো চুলগুলো মাঝে মাঝে একবার হাতে জড়িয়ে মাথার পিছনে চুড়ো করে, তখন কপালটা টানটান দেখাচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে যখন ঘাড়ে ভেঙে পড়ছে সেই এলো খোঁপার তাল,

তখন নন্দার সেই সহজাত কোঁকড়ানো চুলগুলো নেমে এসে কপাল ঢেকে মুখটা বোকাটে করে তুলছে! গায়ে একটা কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা ঢিলেঢালা ব্লাউজ, পরনে একখানা চওড়া পাড়ের শাড়ি! তার সঙ্গে হিহি হাসি! ভাগ্যের মধ্যে ওই পরন পরিচ্ছদটা বেশ একটু দামী আর শৌখিন হওয়া চাই সুনন্দার। তবু রক্ষে! এর উপর যদি ময়লা মোটা পরতো, তাহলে তো আরোই—

আশ্চর্য! মানুষের রুচি এমন বদলায়!

ওই সুনন্দা কলেজে আসতো বেশীর ভাগ দিন পাড়বিহীন কাপড় পরে। হয়তো বা ফিকেরঙা, হয়তো বা সাদা। কেউ যদি কোনোদিন ওই শাড়ির পাড়হীনতা উল্লেখ করতো, সুনন্দা বলতো, ''পাড় মানেই তো সীমার বন্ধনের আভাস! এ একেবারে সীমাহীনতার বাণী বহন করে আনছি!"

রঞ্জন এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলতো, ''ইস্ একেবারে অপার সমুদ্র!"

''না তো কি! কূলছাপানো ভরা গঙ্গাও বলতে পারো।" তাই বলতো রঞ্জন।

সেই পাড়হীন শাড়ির আঁচলটা টানটান করে কোমরে জড়িয়ে টেনিস খেলতে নামতো সুনন্দা সেন, আর সাফল্যের হাসিটা হাসতো রঞ্জন রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

তখন অনেকের ঈর্ষার পাত্র রঞ্জন রায় সৌভাগ্যের গর্বে ফুলে উঠতো! আজ সে বুক ফুলে ওঠে ক্ষোভের নিশ্বাসে!

সেই চটপটে ঝকঝকে প্রাণোচ্ছল মেয়ে!

প্রাণোচ্ছল!

একবার ভেবে নিল রঞ্জন—না, সে উচ্ছলতার কামাই এখনও নেই। প্রাণ দিনরাতই উছলে উছলে উপছে পড়ছে সুনন্দার! হাসিতে টোল খাওয়া আর খুশিতে লাল হয়ে ওঠা ছাড়া আর কোনোরকম মুখ ওর কোনোদিন দেখেছে কিনা মনে করতে পারে না রঞ্জন। অথচ মেয়েদের ওই খুশিতে ডগমগ মুখটা যে দেখতে কত কুশ্রী লাগে সে কথা রঞ্জন ছাড়া আর কে জানে!

আগেও বেশী হাসতো সুনন্দা কিন্তু তার রূপ আলাদা ছিল।

প্রথমদিকে যখন মুটিয়ে যেতে শুরু করেছিল সুনন্দা, রঞ্জন বার বার বলেছিল তোড়জোড় করে ব্যায়াম করতে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! শুধু তো দেহেই নয়, মনে বুদ্ধিতে রুচিতে সব কিছুতেই যে তখন স্থূলতার স্পর্শ লেগেছে সুনন্দার। তাই রঞ্জনের গায়ে গড়িয়ে পড়ে হেসে বলতো, ''দায় পড়েছে আমার খেটেখুটে শ্লিম ফিগার হতে, আর একবার তো বিয়ে হচ্ছে না! বরং সুন্দরী হলেই তোমার ভাবনা বাড়বে, কে কোথা থেকে হয়তো প্রেমে পড়ে বসবে।"

বেশী বললে বলতো, ''কি হবে বাপু চেহারা চেহারা করে, এত বড় বড় ছেলেমেয়ের মা হয়ে গেলাম!"

বলে বলেই যেন ছেলে-মেয়েগুলোকে বড় করে তুলতে চায় নন্দা। নয়তো এই তো সেদিন জন্মালো ওরা।

''হচ্ছে তো!" সর্বশরীরে ঘোষণার হিল্লোল তুলে ঘরে ঢুকলো সুনন্দা, ''হচ্ছে সাজগোজ? নাঃ তোমার আর বয়েস হবে না কোনোদিন। তোমার সাজের বহর দেখে ছেলেমেয়েরা যে কী ভাবে! নিশ্চয় হাসে।"

''কেন, হাসির কি আছে?" রঞ্জন তার দীর্ঘ সুঠাম দেহটা একপাক ঘুরিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, ''হাস্যকর কি দেখেছে তারা?"

''এই তোমার ক্রীম স্নো পাউডার সেন্ট—"

''তা' সেটা এমন কি মহাভারত অশুদ্ধের ব্যাপার! তেল মাখি না? সাবান মাখি না?"

''তার সঙ্গে বুঝি এক হল? সেটা হল দরকার।"

''দরকারের মাত্রা সবাইয়ের সমান নয় নন্দা! আমার কাছে এর সবগুলোই দরকারী। অবশ্য প্রয়োজনীয়। তোমার মত নোংরা যদি আমি না হতে পারি!"

''নোংরা? আমি? এতেও হাসির খোরাক পাচ্ছে সুনন্দা, ''বলতে হয় না! যে আসে সে আমার ঘর-সংসার, রান্না-ভাঁড়ার দেখে ধন্যি ধন্যি করে—বুঝলে মশাই? বলে 'আহা আপনার বাড়ি দেখলে চোখ জুড়োয়, যেন পড়লে সিঁদুর উঠছে'।"

''আর কি! ওই রান্না-ভাঁড়ারই সার বুঝেছ!" বলে আঁচড়ানো চুলটা আবার আঁচড়াতে থাকে রঞ্জন।

''না তো কি? কালভেদে সব কিছুই বদলায়, সারাৎসার জ্ঞানও।" গালে টোল আর চিবুকে খাঁজ পড়িয়ে হাসে সুনন্দা, ''যাই বাবা দেখিগে ঠাকুর চন্দর আমার সাধের

তপ্‌সে মাছের কী দুর্গতি করে বসলো এতক্ষণে, ও বাড়ির রেবার মা বেড়াতে এসে দিল দেরি করিয়ে।"

"রেবার মা!" রঞ্জন খুব নিরীহ ভাবে বলে, "ও বাড়ির ঝি বুঝি?"

"ঝি? রেবার মা ঝি?" চোখ কপালে তোলে সুনন্দা, "এ পাড়ায় নতুন এলে নাকি? রেবাকে চেনো না? না তার মাকে দেখোনি? ফট্ করে অমনি আমার বান্ধবীকে বলে বসলে ঝি!"

"তা কি জানি," আরও অমায়িক ভাব মুখে ফুটিয়ে তোলে রঞ্জন, "চিরকালই দেখে এসেছি বাড়ির ঝি-টিদেরই অমুকের মা তমুকের মা বলে ডাকে লোকে! তোমার বান্ধবী যে—কেন, তাঁর কি একটা নামও নেই?"

"আহা, নাম নেই! আমার বন্ধু বিনামা!" সুনন্দা ঝংকার দেয়, "কেন 'মা' কথাটা বুঝি বড় মন্দ? নাকি সন্তানের নামে পরিচয় খুব খারাপ? মেয়েদের তো ওইটাই শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ও তো আমাকে 'রুনুর মা' বলে ডাকে।"

"চমৎকার করে! অপূর্ব। তা' ছেলেমেয়ে তো মানুষের দু'দশটাই থাকতে পারে, ক'জনের নামে পরিচয় হবে?"

"সে যার যা খুশি। রুনু রেবার বন্ধু, তাই ও আমায় 'রুনুর মা' বলে। আবার নিপুর বন্ধুর মায়েরা আমায় 'নিপুর মা' বলে—"

"থামো থামো ক্ষ্যামা দাও"—ধমকে ওঠে রঞ্জন, "যেমন সব চারটি জড়ভরত জরদ্গব সখী জুটেছে!"

"না, এইবার দেখে শুনে চারটি স্মার্ট ইয়ংম্যান সখা জোটাবো—" বলে আর একবার সর্বাঙ্গে স্ফূর্তির হিল্লোল তুলে চলে যায় সুনন্দ।

আর পরক্ষণেই ঘরের বাইরে তার হৈ হৈ শোনা যায় ঃ "এই সেরেছে, বারোটা বেজে গেল যে। ওরে অ নিপু, অ রুনু, চান করতে গেছিস না বলে আছিস? রবিবার বলে কি নাওয়া-খাওয়াও ছুটি?"

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে নন্দা তার ছেলেমেয়েদের বকছে, কিন্তু কণ্ঠস্বর বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দিচ্ছে। আদর আর প্রশ্রয়ে গলে পড়েছে নন্দার সুরেলা গলাটি। এই গলাটি আজও আছে, আড়াল থেকে শুনলে মনটা পুরনো দিনে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু কাছে এলে? না কাছে থেকে না দূরে থেকে রঞ্জন যেন কিছুতেই আর নন্দার নাগাল পায় না।

রুনু নিপু আর নন্দা ওরা যেন একটা গ্রুপ, এবং ওদের মধ্যে নন্দা সম্পূর্ণ সার্থক। মাতৃমূর্তির বাইরে আর কোনো মূর্তি নেই ওর!

কিন্তু কেন?

ওর সেই প্রিয়া রূপটা কোথায় হারিয়ে গেল? শুধু হারিয়ে গেল? হারানোর লোকসানটাও নন্দার মনের কোথাও দাগ বসাতে পারেনি।

রঞ্জন ভাবলো এটা নন্দার একটা আরোপিত ভাব। যে হেতু একটা ছেলে আর একটা মেয়ে তার হয়েছে, সেই হেতু তাকে সব সময় মাতৃমূর্তি ধারণ করে বসে থাকতে হবে এই ধারণা।

এখনো কি দূর করা যায় না এই ভুল ধারণা? উঠে পড়ে লেগে চেষ্টা করলে।

ছেলেমেয়েদের আওতায় বাইরে সেই ওদের পুরনো পুরনো জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গিয়ে, সিনেমায় গিয়ে মনে পড়িয়ে দেওয়া যায় না নন্দাকে পৃথিবী আজও তেমনিই আছে। অবিকল আছে তাদের সেই পূর্বরাগের দিনের যুগলযাত্রার জায়গাগুলি। হয়তো সেই মনে পড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে থেকেই নন্দা আবার ফিরে পাবে নিজেকে!

কিন্তু কখন পাড়া যায় কথা?

কখন পাওয়া যায় নন্দাকে নিভৃতে?

অনেকদিন থেকেই তো নন্দার ব্যবস্থাপনায় নিপুর বিছানা রঞ্জনের ঘরে, আর পাশের ঘরে স-দুহিতা নন্দার সুখশয্যা!

রঞ্জন যখন এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে উদ্যত হয়েছিল তখন নন্দা দিব্যি হাস্যবদনে বলেছিল, "তা' কি করবো বল? নিপু না হয় একা শুলো, কিন্তু রুনুকে তো আর একটা ঘরে একা শুতে দিতে পারি না।"

"কেন, ওরা তো দুই ভাই-বোন বরাবর একটা ঘরেই শুয়েছে!"

"বরাবরের ব্যবস্থা কি আর বরাবরই বহাল রাখা যায়?"

"তা'হলে এই ব্যবস্থাই বহাল রাখতে হবে?"

"উপায় কি?" অপরূপ ভঙ্গীতে হেসে উঠেছিল নন্দা, "কালে ভবিষ্যতে মেয়েকে যখন জামাইয়ের ঘরে পাঠাবো, তখন অবিশ্যি তোমার একটা সুরাহা হতে পারে!"

"তখন তুমি তোমার সাধের ভাঁড়ারঘরে গিয়ে

শুয়ো”, বলে চলে গিয়েছিল রঞ্জন সেই অপরূপ হাসি আগ্রহ্য করে।

তবু নন্দার ব্যবস্থাই চলে আসছে।

অতএব নিভৃতি নেই।

রঞ্জন ভাবলো খেতে বসে বলবে, ছেলেমেয়েদের সামনেই বলবে। সোজা স্পষ্ট বলবে, “মেট্রোর টিকিট কিনেছি দু'খানা। তোমার ওই রান্নাঘরের কাজটা একটু কমিও সন্ধ্যাবেলা।”

কি করবে ছেলেমেয়েরা? কাঁদবে? হাত-পা ছুড়বে? হাসবে? চুলোয় যাক।

বুকজোর করলো রঞ্জন।

কিন্তু বলা হলো না।

খাওয়ার টেবিলে বলা হলো না। নিজেই রঞ্জন আবহাওয়া খারাপ করে ফেললো। অথচ না করেও উপায় ছিল না। এককাঁসি মাছের ঝাল, তার উপরে একপ্লেট ফ্রাই, সঙ্গে তরিতরকারি মিষ্টি, আবার বাটিভরতি পায়েস নিয়ে খেতে বসেছে নন্দা! যেহেতু রবিবার, অতএব বেলা একটা অবধি বসে বসে রাঁধো আর খাও!

“এইগুলো তুমি খাবে?” রঞ্জন প্রায় ধিক্কার দিয়ে ওঠে।

কিন্তু নন্দা নির্বিকার। দিব্য প্রসন্ন বদনে মাছের কাঁসি টেনে নিয়ে বলে, “খাবো না তো কি দৃষ্টিদান করে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসবো?”

“এই রেটে চালালে এরপর যে আর নড়তে পারবে না!”

“ইস্! তোমাদের অল্পাহারী তিনজনের চাইতে আমি একলা বেশী খাটতে পারি।”

কথাটা মিথ্যে নয়, ভারী শরীর নিয়েও খাটতে পারে নন্দা প্রচুর। বাড়িতে তো হাত-পায়ের বিশ্রাম নেই, পাড়া পর্যন্ত মাতিয়ে বেড়ায়। কাদের বাড়িতে নতুন জামাই আসবে, শৌখিন রান্না রেঁধে দিয়ে আসতে চললো নন্দা, কাদের মেয়েকে 'কনে' দেখতে আসবে, কি কাদের বৌভাতের বৌকে সাজিয়ে বসাতে হবে, নন্দার ঘুম নেই। তাকে সাজাতে ছুটবে নিজের ঘর থেকে উপকরণের খুঁটিনাটি বয়ে।

লোকেদের ছেলেমেয়েদের বিয়ের ঘটকালিতেও নন্দার উৎসাহের অন্ত নেই। কে ভাল শাড়ি কিনবে, কে নতুন গহনা গড়াবে, নন্দাকে তাদের মার্কেটিঙের সঙ্গিনী হতেই হবে!

তবু নন্দার শ্রমশক্তির প্রতি সমীহ দেখালো না রঞ্জন, বিরক্তিবঙ্কিম মুখে বলে উঠলো, “ওই খেয়ে খেয়েই মরবে একদিন!”

“নচেৎ কোনোদিনও মরবো না, কি বলো?” হি হি করে হাসতে হাসতে পরনের শাড়ি মাছের ঝালের রসে মাখামাখি করে বসে নন্দা, “মরতে তো একদিন হবেই। তা' তোমার মত ছটাক মেপে খেয়ে ওজন ঝমিয়ে মরবো কেন? খেয়েই মরবো। লোকের কাঁধে চড়ে যখন যাবো, পথের লোক বলাবলি করবে হ্যাঁ, একখানা লাশ বটে! ভদ্রমহিলা বড়লোকের গিন্নী ছিল সন্দেহ নেই।”

“উঃ কী সান্ত্বনা!”

“নয় কেন? মরে যাবার পরও লোকে আমায় কি ভাববে একথা ভাবতে ছাড়ে কেউ?”

কথার পিঠে কথা বেড়ে প্রসঙ্গ বদলে গেল, বলা হলো না সেই কথাটি।

তা' দুপুরবেলা প্রায় বেলা গড়িয়ে অবশ্য ঘরে এল সুনন্দা। খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুর-চাকরের খাওয়ার তদ্বির করে, ভাঁড়ারঘর সামলে, পানের ডিবেটা হাতে নিয়ে। ছুটির দুপুরে এটুকু পাওনা আছে রঞ্জনের। কিন্তু রঞ্জন কি এই খুড়ী জেঠী মাসী পিসীর মত মহিলাটিকে চায়?

পানের কথাটাই প্রথমে তুললো রঞ্জন।

“রাতদিন এই গালভরতি পান খেতে লজ্জা করে না তোমার?”

“ওমা, শোনো কথা! সত্যিকার 'পানদোষেই' লজ্জা দেখি না লোকের, আর এই নির্দোষ খিলিপানে লজ্জা করবে? রেবার মা এই নেশাটি ধরিয়ে মরেছে।”

হঠাৎ ড্রয়ার থেকে সেই তুলে রাখা ফটোটা টেনে বার করে রঞ্জন, “চিনতে পারো একে?”

নন্দা একটুক্ষণ কৌতুক হাসিমুখে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, “একটু একটু। একটা বাচাল ফাজিল মেয়ে ছিল—”

“দুঃখের বিষয় সেই মেয়েটার অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে, ” রঞ্জন তীব্রস্বরে বলে, “সুইসাইড করেছে মেয়েটা!”

''আহা গো! মরে যাই! বাছা রে!'' সুনন্দা হেসে ওঠে।

''কী ছিলে আর কি হয়েছো বুঝতে পারো?''

''যা ছিলাম তাইই আছি,'' হেসে ওঠে সুনন্দা, ''সেই বাচাল আর ফাজিল। শুধু একটু যা মুটিয়ে গেছি।''

''মুটিয়েছ শুধু দেহে নয়, মাথাতেও। নইলে একটু রাগতেও দেখি না।''

''তোমার কথায় যদি রাগতে শুরু করি, তাহলে তো মুহুর্মুহুই রাগতে হবে। তাতে ছেলেমেয়েদের কাছে মান থাকবে?''

একটু যেন গম্ভীর হয় নন্দা।

''ছেলেমেয়ে আর ছেলেমেয়ে! তুমি এমন ভাব দেখাও, যেন জগতে আর কারুর ছেলেমেয়ে হয় না। দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু বদলাও। রাতদিন তোমার ওই রান্নাঘরে মোগলাই পরোটা চীনে পোলাউ আর নেপালী পাটিসাপটা নিয়ে পড়ে না থেকে আবার বাইরে-টাইরে বেরোতে শেখ। বুঝলে?''

''আহা, আমি কি বেরোই না নাকি? হরদমই তো বেড়াচ্ছি বেরোচ্ছি।''

''তোমার ওই বান্ধবীদের সঙ্গে মার্কেটিং করাকে আমি বেরোনো বলি না। চলো না আজ ফেরি স্টিমারে ঘুরে আসি। রাজগঞ্জে কি—''

''চলো না!'' সুনন্দা মহোৎসাহে উঠে বসে, ''আমি তো সব সময় প্রস্তুত, তোমারই সময় হয় না। ওঠো, উঠে পড়ো।''

''এখন কি, সন্ধ্যেবেলা।''

''আহা ফিরে আসতে তো সন্ধ্যাই হয়ে যাবে। বেশী রাত হলে রুনুটার আবার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে, কাশছে ক'দিন থেকে।''

সুনন্দা যখন কথা বলে, একটানা দ্রুত তালে বলে যায়, কাজেই ওর কথার মাঝখানে কথা কইবার অবকাশ কেউ পায় না। রঞ্জনও পেল না, কথা শেষ হবার পর ভুরু কুঁচকে বললো, ''রুনু।''

এ দৃষ্টি আর এ প্রশ্নের অর্থ বুঝবে না, এত মাথামোটা নিশ্চয়ই হয়ে যায়নি সুনন্দা। তাই উৎসাহ কিছুটা স্তিমিত করে বলে, ''ওরা যাবে না?''

''না!''

''সেটা কি ভাল দেখাবে?''

''কেন, দেখাবে না কেন?'' রঞ্জন তীব্রস্বরে বলে, ''জগতে যে একেবারে চরে বেড়াও না তাও তো নয়। সবাইকেই কি দেখ যে ক'টা ছেলেমেয়ে তাদের আছে, সবকটাকে আঁচলে বেঁধে বেড়াচ্ছে?''

সুনন্দা ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলে, ''তাই কি বলছি? আমার কেমন ভাল লাগে না। ওরা পড়ে থাকবে, আমরা সেজেগুজে বেড়াতে যাবো। তাছাড়া—'' থেমে যায় সুনন্দা।

''ওরা শিশু নয় যে মা-বাপের এই হৃদয়হীনতায় কাঁদতে বসবে, বুঝলে? ও যুক্তিটা অচল। কিন্তু তোমার তাছাড়াটা কি?''

সুনন্দা মুখ তুলে হেসে ফেলে বলে, ''শিশু নেই, সেটাই তো সমস্যা। নিপু তো খেলতে যাবে, এই সন্ধ্যাবেলা, রুনুকে অতক্ষণের জন্যে একলা বাড়িতে রেখে যাবো? গানের মাস্টার আসবে।''

''ছি ছি, নন্দা, ছি ছি!'' ধিক্কারে দগ্ধ করে ফেলতে চায় রঞ্জন, ''মনটাকে এত সেকেলে আর এত নীচ করে ফেলেছ! আশ্চর্য! তুমি না একসময় বি. এ. পাস করেছিলে? বিশ্বাস হয় না। ওই বাচ্চা মেয়েটা সম্পর্কে এই কথাটা উচ্চারণ করতে তোমার দ্বিধা হলো না?''

''বাচ্চা বললেই বাচ্চা!'' সুনন্দা প্রবল স্বরে বলে ''পনেরো বছর তো পার হতে চললো—''

''সেটা একটা বয়েস নয়! আসলে কথা ওটা তোমার একটা ছুতো। মনে মনে এমনই স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে যে, জীবনকে উপভোগ করবার ক্ষমতাও আর নেই তোমার! ঠিক আছে, তুমি তোমার মেয়েই পাহারা দাও, যেতে হবে না।''

''তা' নিপু না গেল, না গেল, ওকে অন্ততঃ নিয়ে গেলেই বা কি হয়?'' সুনন্দা আপোসের সুরে মুচকে হেসে বলে, ''পাঁচটা বাইরের লোকের সঙ্গেই তো যাওয়া, দু'জনে তো আর গলা ধরাধরি করে যাবো না!''

''রাবিশ্!'' বলে সহসা উঠে পড়ে রঞ্জন, এবং তোয়ালে সাবান হাতে করে বাথরুমে চলে যায়। অর্থাৎ একাই প্রস্তুত হতে চললো। সঙ্গিনীর প্রয়োজন তার নেই।

তা' রঞ্জন বিনাবাক্যে সাজগোজ করে নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়, সুনন্দা কি তাকে সাধতে যাবে?

রাগ সে সহজে করে না, তবু মনে মনে বিরক্ত হলো রঞ্জনের অবুঝপনায়। মেয়েটাকে সঙ্গে নেবার কথাই এতই রাগ হলো বাবুর যে কথাই কওয়া হলো না। কেন, তাতে ক্ষতিটা কি হতো? দু'জনে একলা বেড়িয়ে বেড়াব, এমনই বা বাসনা কেন? তরুণ-তরুণী নাকি? যে বয়সে যা মানায়। দু'জনে গায়ে গা ঠেকিয়ে রাস্তায় না বেড়ালে আর জীবনকে উপভোগ করা হলো না? শুধু কাছাকাছির মধ্য দিয়ে অন্তরে অন্তরে স্পর্শ পাওয়া যায় না? ভালবাসা কি দশজনকে দেখিয়ে বেড়াবার জিনিস?

কিন্তু সুনন্দার সিদ্ধান্তই যে ঠিক তাই বা কে বলবে? জগতের পথে বেরোলে তো মনে হয় সেটা বুঝি দেখিয়ে বেড়াবারই জিনিস।

পতিদেবতারা কতদূর বশংবদ হতে পারেন এবং প্রেমসোহাগিনী স্ত্রীরা কতদূর ঝংকারময়ী হতে পারেন, পথেঘাটে তো অহরহ তারাই লীলাবিকাশ।

সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে সহসাই এমনি এক বন্ধু দম্পতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রঞ্জনের।

না, স্টিমারে বেড়াতে যায়নি রঞ্জন, এমনিই গাড়ি নিয়ে বেড়াচ্ছিল রেড রোড ধরে, হঠাৎ পাশের একখানা গাড়ি থেকে কে চেঁচিয়ে উঠলো, ''আরে, আস্তে আস্তে!''

দুটো গাড়িই থামলো।

একখানি গাড়ি থেকে দুটি মুখ ঝলসাল, আর একখানি থেকে একটিই। সতীর্থ সুবিমল ঘোষ! বহুকাল পরে দেখা।

''কী ব্যাপার! একা একা বিরহীর মত ঘুরছো যে?'' হৈ হৈ করে উঠলো সুবিমল। তারপর সারা সন্ধ্যাটা তারা তিনজনে একত্র কাটালো। মাঠে বসে ছেলেবেলার গল্প করলো, নামী রেস্তোরাঁয় ঢুকে অনেকগুলো টাকা খরচা করে সামান্য কিছু খেলো, পরস্পর পরস্পরকে বাড়িতে আসার নেমন্তন্ন করলো, এবং অতঃপর বিদায় নিল।

কিন্তু রঞ্জনের মন থেকে কি বিদায় নিতে পারলো ওরা? বন্ধুপত্নীর সেই প্রতিকথায় 'প্রণয়কলহের' কলকাকলি, এবং সেই ঈষৎ কাজলটানা চোখে স্বামীর প্রতি মুহুর্মুহু বিলোল কটাক্ষপাত বুকের মধ্যে বার বার ছায়া ফেলতে লাগলো না কি রঞ্জনের! আর সেই ছায়ায় ছায়ায় হঠাৎ মনে হলো তার সমবয়সী সহপাঠিনীকে বিয়ে করার মত ভুল সংসারে বোধকরি অল্পই আছে।

সুবিমলের চাইতে সুবিমলের বৌ কোন্ না দশ-বারো বছরের ছোট হবে। আর ছোট বলেই না আজও সুবিমল ওই সপ্রেম চাহনির মার খাবার সৌভাগ্য ভোগ করছে।

আচ্ছা—দশ-বারো বছর পরে সুবিমলের বৌও কি নন্দার মতই বুড়িয়ে যাবে? নাকি যাবে না?

হয়তো যাবে। কিন্তু কেন?

মেয়েরা কেন এমন তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায়?

বাড়ির থেকে খানিকটা দূরে গ্যারেজ।

গাড়িখানা গ্যারেজে ঠেলে পুরে রেখে দিয়ে ওই কথাটাই ভাবতে ভাবতে আসছিল রঞ্জন, হঠাৎ মুখের উপর শপাং করে এক চাবুকের ঘা খেলো!

না, সত্যিকার চামড়ার চাবুকের অবিশ্যি নয়, মনের চামড়ায় কেটে বসে এমন একটা দৃশ্যের চাবুক।

কয়েক মুহূর্তের জন্য পাথর হয়ে গেল রঞ্জন, শুধু ঝাপসা চৈতন্যের উপর একসঙ্গে ভাসতে থাকলো ঈষৎ কাজলটানা দু'জোড়া কালো চোখের দৃষ্টি। দু'জোড়াই অবিকল এক জাতের, একেবারে এক!

সপ্রেম বিলোল বঙ্কিম!

ভুল হবার নয়। সুবিমলের সেই হাস্যলাস্যময়ী পূর্ণযৌবনা স্ত্রীর কাজলকালো চাউনি এখানে এল কেমন করে?

রঞ্জন কি সামনে এগিয়ে যাবে? হঠাৎ বড়রকমের একটা ধমক দিয়ে দেখবে ওই দৃষ্টিটা বদলে গিয়ে আর কি রকম হয়ে যায়?

নাঃ দেখা হলো না।

পারলো না রঞ্জন এগিয়ে যেতে। শুধু রাস্তার ধারের এই বড় বাড়িটার ছায়ায় কোণের দিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, সেই দৃষ্টি শেষবারের মত আর একবার বিদ্যুৎ হেনে কেমন করে বিদায় নিয়ে ফিরে গেল, আর কেমন করে সেই দৃষ্টিবাণাহত ব্যক্তিটি চলে যেতে গিয়েও বার বার ফিরে ফিরে তাকিয়ে তবে পথ ধরলো।

কে ওরা?

রুনু আর রুনুর গানের মাস্টার না?

রঞ্জন কি ঠিক দেখেছে?

এ দেখা কি ভুল হয়? কিন্তু এ কটাক্ষ রুনুর চোখে এল কি করে? পেল কোথায়?

ওরা চলে গেছে, তবু সেই ফাঁকা জায়গাটার দিকেই তাকিয়ে থাকে রঞ্জন, আচ্ছন্নের মত। ওর অনেকদিনের তীব্র প্রশ্নটার উত্তর পেয়ে গিয়েছে বলেই কি এমন স্তব্ধ হয়ে গেছে?

মেয়েরা এত তাড়াতাড়ি যৌবনবতী হয়ে ওঠে বলেই বুঝি এত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায়! আর এই সব নবযৌবনাদের উপর খবরদারি করতে করতে একেবারে বুড়িয়ে যায় তাদের মায়েরা।

দোষ দেওয়া বৃথা। নিশ্চিন্ততা ঘুচলে আর রইলো কি?

আর যদি দোষ দিতে চাও রুনুকে অথবা রুনুদের?

না, তাদেরই বা দোষ কোথা?

প্রকৃতি যদি তাদের হাতে সহসা এক ঝকঝকে নতুন ধারালো অস্ত্র তুলে দেয়, তারা তার সদ্ব্যবহার করবে না?

বৈশাখ ১৩৬৮

তৃষ্ণা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ গভীর নীল আর বিশাল সমুদ্র অতি স্বচ্ছ এবং মহিমময়। নিরিবিলি এবং শান্ত। এমন কি সমুদ্রের গর্জন পর্যন্ত কানে আসে না। শুধু দু-একটা অ্যালবাট্রস পাখির কর্কশ ডাক মাঝে মাঝে এই ছোট্ট বন্দরটাকে সচকিত করে তুলছে। সামনে পাহাড় শ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে কিছু উপত্যকা, সেখানে সব শহরের ঘরবাড়ি কেমন যেন স্বপ্নের মধ্যে নিমজ্জিত। সে একা রেলিংয়ে ভর করে এ-সব দেখছিল। মাঝ-রাতে জাহাজ ঘাটে বাঁধাছাদা শেষ। জাহাঙ্গিরা যে যার ফোকসালে চলে গেছে। কাপ্তানের ঘরে আলো জ্বলছে না। ইঞ্জিন রুম থেকে টিণ্ডাল উঠে যাবার সময় ওকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠাট্টা করেছে, কি, বাড়ির জন্য মন কেমন করছে।

সে সামান্য হেসেছিল। জবাব দেয়নি।

এটা তার হয়। দূর সমুদ্র সফরে সে বুঝেছে, বন্দরে জাহাজ ভিড়লে, বাড়ির জন্যে আরও বেশি মন খারাপ লাগে। জাহাজে সফর করলে মানুষ কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। একটানা বিশ-বাইশ দিন, কখনও মাস পার হয়ে যায় সমুদ্র পাড়ি দিতে। তারপর এক সকালে কিংবা মধ্যরাতে জাহাজ বন্দরে ঢুকে গেলে এটা আরও বেশি মনে হয়। যেন সারা সমুদ্র দাপিয়ে জাহাজটা ক্লান্ত অবসন্ন। থেকে থেকে অ্যাকজস্ট স্টিমের ফোঁস ফোঁস শব্দ তার কাছে দীর্ঘশ্বাসের মতো মনে হয়।

এ-সময় সে কাঁধে মৃদু চাপ অনুভব করে। ফিরে দেখে সেনদা পেছনে।

চল নিচে। কী ঠাণ্ডা হাওয়ারে।

এতক্ষণে মনে হলো, সত্যি ভারি ঠাণ্ডা হাওয়া সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। সে ওভারকোটের কলার টেনে গলা ঢেকে দেবার চেষ্টা করলে সেনদা বলল, জাহাজে কেন মরতে এলি! বন্দর এলেই ডেক থেকে আর নামতে চায় না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তুই এখনও ডেকে একা দাঁড়িয়ে।

কথাটা সেও জানে। বন্দরে জাহাজ ভিড়লে ইঞ্জিন রুমে তেমন কোনো কাজ থাকে না। শুধু ধোয়ামোছা এবং রঙ করার কাজ। খুব হাল্কা। বন্দরে দিনগুলি মোটামুটি ছুটিছাটার মতো কেটে যায়। রোববার শনিবার পুরো ছুটি। এই মধ্যরাতে ইঞ্জিন রুমে নিশ্চয়ই ফিফ্‌থ ইঞ্জিনিয়ার জেগে। আর গ্যাংওয়েতে কোয়ার্টারে মাস্টার। আর একজন সে নিজে। সে নেমে যাবার সময় বলল, আমার তো মনে হয় সেনদা জাহাজটা আর দেশে ফিরবে না। চল না বেটা কাপ্তানকে ধরে একদিন পেটাই।

সেনদা জানে, অঞ্জন এ-ভাবেই কথা বলে। আসলে দুটো সিক্‌নেসে জাহাজীরা খুব ভোগে।

একটা সি-সিক্‌নেস, অন্যটা হোম-সিক্‌নেস। অঞ্জন কাউকে পেটাতেও জানে না, পেটাতে ভালবাসেও না। ওর হোম-সিক্‌নেসটাই একটু বেশি। জাহাজে নতুন উঠলে এটা হয়। তাদেরও হয়েছিল। এখনও যে বাড়ির জন্য মন কেমন করে না, তা নয়, তবু অঞ্জনের মতো একেবারে চুপ মেরে যায় না। অঞ্জনও জাহাজে চার-পাঁচ বার সফর করলে ঠিক তাদের মতো হয়ে যাবে। ভেতো বাঙালীর যা স্বভাব, অঞ্জনের মধ্যে এখনও সেটি দানা বেঁধে আছে। বন্দর এলেই বের হতে চায় না। বের হলেও কোনো পার্কে কিংবা বেলাভূমিতে চুপচাপ বসে থাকে। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায়। আসলে সে মেয়েদের একটু বেশি সমীহ করে। আর এই সব দেশের মেয়েরা তো যেন পাখা গজিয়ে নিয়েছে। ছুঁতে গেলেই উড়ে যাবে। সুতরাং কাছে না যাওয়াই ভাল। স্বপ্ন ভঙ্গের ভয়েও অঞ্জন হয়তো বন্দরে নেমে তেমন হৈ-চৈ করতে পারে না।

সেনদার পিছু পিছু সে ফোকসালে নেমে গেল। ঘরগুলো জাহাজের তলায় এবং এক আশ্চর্য উষ্ণতা সব সময়। ডেক থেকে নেমে ফোকসালে ঢুকে গেলে এই উষ্ণতা সে আরও বেশি টের পায়। ওভারকোট খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে, কম্বলের মধ্যে ঢুকে পড়ার সময় সেনদা বলল, বিকেলে আমার সঙ্গে বের হবি। সুন্দর একটা পার্ক আছে। ওখানে তোকে নিয়ে যাব।

অঞ্জন বলল, না, আমার সহ্য হবে না দাদা। কোথাও বের হচ্ছি না।

সেনদা জানে, অঞ্জন এ রকম স্বভাবের। সব সময় ভয়, কোনো খারাপ মেয়েছেলের পাল্লায় না পড়ে যায়। বয়স কম বলে এটা তার এখনও আছে। তাছাড়া বোধ হয় ওর মধ্যে এখনও পাপবোধ খেলা করে—কারণ ভালবাসা বিষয়টা তার কাছে বড় গভীর গোপন বিষয়। সে কোনো মেয়েকে ভালবাসার চেষ্টা করেছে কি না জানা নেই— কিংবা দেশবাড়ির গল্প বলার সময়, সে কখনও কোনো মেয়ের সংস্পর্শে এসেছে বলেও তারা জানে না। বিশ-বাইশ বছরের ছোকরাদের যেমন আদর্শ থাকে, মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, অথবা বলা যায় এক রহস্যময় জগৎ, তার ধারে-কাছে যে যায়নি, সে কি করে মেয়েদের চটুল চরিত্র নিয়ে খোশ গল্পে মেতে উঠতে পারে।

সেনদা উপরের বাঙ্কে উঠে গেল। কম্বল টেনে দেবার সময় বলল, পিকাঝোরা পার্কে দু-আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন সব গাছ আছে। এখানে এলে অনেকে গাছগুলো দেখতে যায়।

দু-আড়াই হাজার বছরের?

কত বড় গাছ রে! ট্রামে বাজারের স্টপে নেমে হেঁটে চলে যায়। প্রেস বেটেরিয়ান চার্চ পার হয়ে গেলেই পার্কটা পাওয়া যায়। দেখবি তোর বয়সী কত সব সুন্দরী মেয়ে পার্কটায় বেড়াতে আসে। গাছটার নিচে বসে দু'জনে একটু খাব! কেমন!

আমি ওতে নেই। খেলে তোমার হুশ থাকে না। কে সামলাবে?

পাশের বাঙ্ক থেকে বঙ্কিম হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—কি তোরা এত রাতে বকর বকর করছিস! ঘুমোতে দিবি না?

সুতরাং আর কথা নয়। অঞ্জন বলল, সেনদা আবার ক্ষেপে গেছে। খাবে বলছে।

বঙ্কিম উঠে পড়ল। বোধ হয় বেটার বাথরুম পেয়েছে। সে নেমে উপরে চলে গেল। সেনদা বলল, শালা কঞ্জুস!

পরদিন দেখা গেল, দুজন নাবিক জাহাজ থেকে শহরের দিকে হাঁটছে। ওদের গায়ে নীল রঙের কোট। মাথায় টুপি। যদিও ঠাণ্ডা প্রবল নয়—কারণ এ-দেশে এটা এখন গ্রীষ্মকালই বলা চলে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়। দূরে এগমন্ট হিলের পাহাড় শীর্ষে রোদ ঝলকাচ্ছে। কৌরি পাইনের ছায়ায় পাহাড় ঢাকা। সামনে বাঁ দিকে বেলাভূমি। বড়দিন আসছে। শহরটাতে হেঁটে গেলেই বোঝা যায়। ডান দিকে সি-ম্যান মিশন। সেনদা এই নিয়ে এখানে বার চারেক এসেছে। মোটামুটি পথঘাট চেনা। নাম ভুলে গেলেও সে জানে, মিশন পার হয়ে গেলেই একটা ট্রাম-লাইন পাওয়া যায়। এক বগির ট্রাম। ওতে উঠে পড়লেই হয়। এই একটাই ট্রাম-লাইন। বন্দর এলাকা থেকে শহরের মার্কেট এলাকায় ঢুকে শেষ হয়ে গেছে। যেন উপকথার ছবির মতো শহরটা। অঞ্জন ট্রামের জানলায় মুখ বাড়িয়ে এটা আরও বেশি টের পেল। লাল-নীল রঙের সব কাঠের বাড়ি। সিঁড়ির মতো সারি সারি সব ছোট উপত্যকা নেমে গেছে। দূর থেকে মনে হয় ছোট ছোট মিকি মাউসের মতো ঘর। কোথাও খাড়া পাহাড়ের গায়ে জমি সমতল করে স্কুলবাড়ি। ছেলেমেয়েরা ছুটছে। নীল-হলুদ জামা পরে। গলায় স্কার্ফ। দেখলে মনেই হবে না, পৃথিবীতে কোনো দুঃখ আছে। সে মুখ বাড়িয়ে এসব দেখার সময়, কোনো তরুণীর মুখ দেখতে পায় জানলায়। মুখটা কেমন ছবির মতো আটকে থাকে কিছুক্ষণ মনের পর্দায়। স্বপ্ন তখন ভিতরে খেলা করে। এই একটা খারাপ স্বভাব হয়ে গেছে তার বন্দরে ঘুরতে ঘুরতে। কোনো সুন্দর নারী জানলায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখলে, সে সেখানে আবার ফিরে যেতে চায়। চোখ তুলে তাকালে তো কথাই নেই। দেশবাড়ি ছেড়ে যত দূরেই যাক, এই একটা টান সব বন্দরের জন্য তার গড়ে উঠেছে।

সহসা সেনদা বলল, এই নাম।

ট্রাম কনডাক্টর এবং দু'জন মধ্যবয়সী রমণীর মধ্যে তখন কি নিয়ে বচসা শুরু হয়েছিল। এর আগে ট্রামের সব যাত্রীরা তাদের দেখছিল—চোখ এবং চুল দেখলেই বোধ হয় বুঝতে পারে তারা ভারতীয় নাবিক। অঞ্জন ভাবছিল, সব দেশেই তবে ট্রাম কিংবা বাস কন্ডাক্টারের সঙ্গে বচসা হয়। নাম বলাতে সে তাড়াতাড়ি উঠে, সেনদার পেছনে পেছনে নেমে গেল।

ট্রামে-বাসে সর্বত্র সে দেখছে, দু-রকমের লোক শহরটায় থাকে। ঠিক বাঙালী পুরুষ-রমণীর মুখের আদল। কারো কারো চুল কোঁকড়ানো, কারো কালো চুল—এরাই বোধ হয় তবে এখানকার মাউরি উপজাতি। দোকান সাজিয়ে বসে আছে মেয়েরা। ফলের কিংবা কেকের দোকান। মিনি স্কার্ট পরনে। গায়ে লতাপাতা আঁকা জ্যাকেট।

সেনদা বলল, পা চালিয়ে হাঁট না।

অঞ্জনের এই একটা স্বভাব—সহজে সে হেঁটে যেতে পারে না। চারপাশের মানুষজন দেখতে তার ভারি ভাল লাগে। এ-সব দেশের নাম সে ভুগোল বইয়ে পড়েছে। বাড়িগুলো যেন এক একটা রঙিন ছবি। এর ভেতর কোনো

তরুণী হেঁটে চলে গেলে কার না ভাল লাগে। সেনদার সে-সব নেই। গোলাপ বাগানে কোনো তরুণী দাঁড়িয়ে থাকলে একজন পুরুষের জীবনে কি যে রহস্য খেলা করে বেড়ায়, সেনদা বোঝে না।

ওরা একটা বড় রাস্তা পার হয়ে গেল।

অঞ্জন দেখল, সাইনবোর্ডের নিচে লেখা রয়েছে প্রিন্স স্ট্রীট। এ-রাস্তাটায় সে কিছু দালান-কোঠা দেখতে পেল। এ-জায়গাটা তার তেমন ভাল লাগল না। হেমন্তে পাতা ঝরে গেলে যে নৈঃশব্দ্য তাড়া করে, এখানটায় তাকে তা করল না। সে সহজেই দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটতে পারল। আর তারপরই অবাক! এক গভীর বনাঞ্চল সামনে। এ তো পার্ক নয়, বনভূমি বলা যায়। সরু পিচ বাঁধানো রাস্তা। দু-পাশে গভীর বনজঙ্গল। আর মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে অতিশয় সব প্রাচীন বৃক্ষ। ঢোকার মুখে সারি সারি অজস্র লাল নীল সাদা রঙের গাড়ি।

কিছুটা ঢুকেই দেখল, সবুজ পাতার সব কুটির। এগুলো কেন? প্রশ্ন করতেই সেনদা বলল, তাকাবি না সোজা চলে আয়।

তাকালে কি হবে?

হ্যাংলা ভাববে।

দরজা ভেজানো। কোনোটা খোলা। অনেকটা জায়গা জুড়ে নরম ঘাসের চত্বর। অঞ্জন বলল, জানো, এ-জন্য আসি না। কী খারাপ লাগে বলো!

সত্যি খারাপ লাগে বলছিস!

না, ঠিক খারাপ না।

আমার তো খুব ভাল লাগে। যাবি নাকি ভেতরে?

গরিব মাউরি মেয়েরা গাঁ থেকে সব এখানে এসে উঠেছে। বড়দিন আসছে, স্ফূর্তি করবে না। কম পয়সায় হয়ে যাবে।

অঞ্জন বলল, এই তোমার দু-হাজার বছরের গাছ দেখানো। এর নাম করে নিয়ে এলে!

চারপাশে গিজগিজ না করলেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সব মানুষজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুড়ো-বুড়ি আছে, যুবক-যুবতী আছে, আবার শিশুরাও খেলা করছে। ঝিলের ধারটায় সব সাদা বোট। যে কোনো একটা ভাড়া করে ভিতরের দিকে ঢুকে যাওয়া যায়। বিচিত্র সব গাছপালার জঙ্গলে ঝিল থেকে অজস্র খাড়ি ঢুকে গেছে ভেতরে। যে কেউ ভিতরে ঢুকে গেলে অদৃশ্য হয়ে যায়। অবশ্য এ ধরণের পার্ক বিদেশের সব বন্দরেই কম-বেশি সে দেখেছে। জোড়ায় জোড়ায় জাপ্টে পড়ে থাকে। পাশ দিয়ে গেলেও হুঁশ থাকে না।

সেনদা বলল, বুঝলি, তুই নতুন তো, চোখে লাগে। ঘুরতে ঘুরতে এ-সব তোর একদিন গা-সওয়া হয়ে যাবে। ঝিলটার ওপাশ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তাটার মুখেই সেই অশোক বন।

দু-আড়াই হাজার বছরের গাছ? সেটা কি করে বোঝা যায়।

এমনি দেখে বোঝা যাবে না। সাইনবোর্ড আছে। আচ্ছা ভাবতো, সেই কবে তখন আমাদের দেশে সীতার বনবাস পর্ব শুরুই হয়নি—ভাবতে অবাক লাগে না। তখন থেকেই গাছগুলি আছে!

গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে এমনিতেই অঞ্জনের ভাল লাগে। এ আবার দু-আড়াই হাজার বছরের পুরনো গাছ। সেও ভারি রোমাঞ্চ বোধ করল। রাস্তাটায় ঢুকে মনে হলো, ভারি নির্জন। গাছ লতাপাতা সরিয়েই প্রায় যেতে হচ্ছে। বড় বড় সব নীল বর্ণের পাতার ফাঁকে-ফোকর কোথাও যে কেউ নেই তা অবশ্য বলা যাবে না। তবু অঞ্জনের মনে হলো, এমন নির্জন পথে সে কোনোদিন হেঁটে যায়নি। এমন এক নির্জন পথে রামচন্দ্র বোধ হয় সীতাকে বনবাসে নিয়ে গেছিল।

তারপর সহসা রাস্তাটা শেষ হতেই উন্মুক্ত প্রান্তর। এবং সেই আবার সবুজ পাতার কুটির। ঘাসের মধ্যে পা ডুবিয়ে কেউ কেউ হাতে গ্লাস নিয়ে বসে আছে। রোদের শেষ উষ্ণতা তখন মরে যাচ্ছিল।

ওই সেই গাছ। সেনদা গাছগুলির দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

অঞ্জন দেখল, কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, সাদামাটা। বড় এবং অতিকায় সন্দেহ নেই। তার নিজের মুলুকে অতিকায় কোনো বটগাছের মতো। তবে ঝুপড়ি গাছ নয়। একটেরে লম্বা। এখানে এমন অনেক গাছ আছে। গাছের গায়ে সব বছরের উল্লেখ। কোনোটা হাজার-দেড় হাজার বছর পার করে দিয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীন গাছটার নিচে এসে দাঁড়াতেই তার যেন কেমন মনে হলো রামায়ণ-মহাভারতের দেশে সে সত্যি চলে এসেছে!

আর তখনই সেনদা বলল, ওই সেই বার। এক বুড়ী তার মালিক। খুব হাসিখুশি। পা চালিয়ে হাঁট।

অঞ্জন গাছটার নিচ থেকে যেতে চাইল না। চারপাশে ইতস্তত ভ্রমণবিলাসীদের দেখা যাচ্ছে। কোন্ মুলুক থেকে কে এসেছে সে জানে না। সুন্দর মতো এক সোনালী চুলের যুবতী পটাপট ছবি তুলছে। একজন প্রৌঢ় মতো ব্যক্তি উদাসীন চোখে দেখছে সব কিছু। চঞ্চল বালক-বালিকারা ছোটাছুটি করছে। ওরাও বোধহয় জেনে গেছে, সব মানুষের মধ্যেই আছে কোনো এক অলৌকিক রামায়ণ-মহাভারতের দেশ। যার যেমন—অঞ্জন হাত-পা ছড়িয়ে গাছটার নিচে বসে পড়ল। বলল, অমি যাব না, তুমি যাও। খাও গে।

সেনদা পাশে এসে বলল, বেশি না, একটু খাবি।

না, ভাল লাগছে না। তোমার ছাইপাঁশ খাওয়ার চাইতে আমার গাছটার নিচে বসে থাকতে ভাল লাগছে। গাছটা কী গাছ বল তো!

কৌরি পাইন। খুব রেয়ার স্পেশীজের গাছ। পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

অঞ্জন কেমন ভারি গলায় বলল, সীতার বনবাসের সাক্ষী গাছটা—কি বল! সেনদা কেমন বিস্ময়ের চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলে সে বললে, বারে, সীতার বনবাসের সময় থেকেই তো গাছটা বড় হচ্ছে। তুমিই তো বললে।

তা হচ্ছে।

অঞ্জনের এমনই স্বভাব—কেমন সব কিছুতে সুদূরের গন্ধ পায়। সেনদা বলল, ঠিক আছে বোস। আমি অর্ডার দিয়ে আসছি।

এটা মন্দ না। যদি এখানে দিয়ে যায়, ভালই লাগবে। অঞ্জন ঘাসের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। গাছটার নিচ দিয়ে পাকা রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। বোধ হয় এই বনভূমি পার হয়ে রাস্তাটা গেছে ডুনেডিনের দিকে। কিংবা অকল্যান্ড ছাড়িয়ে দ্বীপের শেষ মাথায়। অতিকায় দুটো দ্বীপ নিয়ে এই দেশটা। ইংরেজরা বোধ হয় এমন এক আশ্চর্য দ্বীপ আবিষ্কার করে আর ফিরে যেতে পারেনি। এখানে ঘর-বাড়ি, শহর, বন্দর তৈরি করে সবাই তারা থেকে গেল। দেশ, বাড়ির কথা, প্রিয়জনের কথা তাদের মনে থাকল না।

অঞ্জন দেখেছে, কোনো সুন্দর জায়গা দেখলে তারও ইচ্ছে হয় সেখানে সে থেকে যায়। এবং যদি কোনো তরুণী তাকে দুটো কথা বলে, তবে তো কথাই নেই। এই এক গভীর আকর্ষণ কিসের টানে যেন মনের মধ্যে গড়ে উঠছে। সে তার সমবয়সী মেয়েদের দেখতে বড় ভালবাসে। জাহাজে মধ্যরাতে দাঁড়িয়ে সে তার সেই গোপন পৃথিবীর কথাও ভাবে। কেমন বিষণ্ণতা টের পায়—তার তখন দূরবর্তী কোনো নির্জন দ্বীপে হেঁটে যেতে ইচ্ছে করে।

আর তখনই হাজির। একটা ট্রেতে দুটো গ্লাস। আগে আগে সেনদা। মাঠটা পার হয়ে আসছে কেউ। হাতে সেই ট্রে। পরনে সাদা স্কার্ট। নীলাভ চুল এবং কাছে এলে দেখল, বালিকার দু'চোখে কৌতূহল। কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে ট্রে-টা রাখল। ওর দিকে একটা গ্লাস বাড়িয়ে দেবার সময় সেনদা ঠাট্টা করে বলল, আমাদের রামচন্দ্র। অশোক বনে সীতার খোঁজে এসেছে।

অঞ্জন বলল, কি বকছ সেনদা! এখনও তো খাওনি।

মেয়েটি হাসল। বাংলা ভাষা কে আর বোঝে! তবু মনে হয় যেন সেনদা বুড়ীকে পটিয়েছে, ওখানে একজন জাহাজের ভাল ছেলে বসে আছে। কিছুতেই আসবে না বলছে। একবার নাতনিকে তোমার পাঠিয়ে দেখতে পার। সেনদা বলতে পারে না, হেন কথা নেই। বৌদি সম্পর্কে এমন চরম রসিকতা করে জাহাজে যে তার কান গরম হয়ে যায়।—তোর বৌদি বাছা তোকে পেলে কী পরম আদরে ওম দেবে দেখিস। আমি তো শালা বুড়ো জাহাজী। আমার শরীরে বড়ো আঁশটে গন্ধ। আর তুমি নতুন জাহাজী, তোমার শরীরে সবুজ গন্ধ। কোন্ যুবতীর মাথা ঠিক থাকতে পারে বল!

সেনদা বলল, গোধুলি লগ্ন চলছে, বুঝলে? আকাশ-বাতাস সব যেন কেমন মিহি সুতোর মতো পাতলা! এ সময়টায় সবার মনে রঙ ধরে জানিস!

অঞ্জন দেখল, বালিকার ববছাঁট চুলে একটা সোনালী প্রজাপতি ক্লিপ। হাতের আঙুল নরম চাঁপা ফুলের মতো। হাইহিলের জুতো পরে গোড়ালি ভারি উঁচু করে রেখেছে। স্কার্টের ফাঁকে উরু দেখা যায়। কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠে বালিকার নাভিমূল। অঞ্জন কি ভেবে কেন যে সবটা একসঙ্গে খেতে গিয়ে বিষম খেল!

মেয়েটি তখন ফিরে যাচ্ছিল। বিষম খেতেই ফিরে দাঁড়াল। দেখছে সেই বয়স্ক নাবিকটি বাচ্চা নাবিকের মাথায় ফুঁ দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি ট্রে ফেলে সেও ছুটে এল। কাছে এসে বলল, কী হয়েছে?

অঞ্জন মুখ মুছে বলল, কিছু না।

সেনদা বলল, বলেছি রাক্ষসের মতো খাস না। অভ্যেস নেই। আমি পারি বলে তুইও পারবি। সবাই সব পারে।

ঘাসের উপর কনুইতে ভর করে সেনদা খাচ্ছিল। অঞ্জন মাথা গুঁজে বসে আছে। মেয়েটার শরীরে যেন সেই হাজার বছর আগেকার তৃষ্ণা, একই রকম ভাবে ফুটে আছে। অঞ্জন লোভে পড়ে গিয়ে সবটা একসঙ্গে খাওয়ার চেষ্টা করেছিল।

সেনদা সিগারেট ধরাবার জন্য উঠে বসেছে। পকেট হাতড়াবার সময় বলল, কেমন জিনিস দেখলাম বল। পূত পবিত্র। এ জিনিস দেখার পর আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে? বল—করে?

অঞ্জন বলল, গায়ের রঙ দেখেছ!

ওরা মাউরি ট্রাইবস। নাম জিজ্ঞেস করলে কি যে বলে বোঝা যায় না। ওয়াকা, ঝিশকু, 'কি' প্রত্যয়, সর্বত্র।

'কি' প্রত্যয় মানে?

আরে এই টিকাকি, বোয়াকো, কনটিকি, এমন সব নাম। মেয়েটি তখন এসে গেছে। চুল হাওয়ায় উড়ছে। হাঁটু মুড়ে বসলে স্কার্টের ফাঁকে সাদা প্যান্ট—নিটোল নিভাঁজ—অঞ্জনের সারা শরীরে কেমন আগুন ঝলকাচ্ছিল তখন। সে কোনরকমে গ্লাসটা তুলে নিয়েছে। হাতে কোন জোর পাচ্ছে না।

সেনদা সিগারেট ধরিয়ে কাঠি নেভাবার সময় বলল, তোমার ঠাকুমা দেখছি এবারে বেশ বুড়িয়ে গেছে। দেশে যাওনি?

মাথা নাড়ল মেয়েটি।

সেনদা তবে এদের অনেক খবর রাখে।

সেনদা বলল, তোমার নামটা কিন্তু ভুলে গেছি—

মেয়েটি মুচকি হেসে দৌড়ে পালাল।

তোমার যে কি না। যত খেঁজুরে আলাপ। মেয়েটা চলে যাওয়ায় সেনদার উপর অঞ্জন বিরক্ত। ধুস, তুই বুঝিস না। কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে ভাল লাগে না। এই তো চলে গেল—সব ফাঁকা। কেমন অর্থহীন। দেখ অঞ্জন, নারী হচ্ছে দেবী, তাকে যত পূজা দিবি তত সুখ পাবি। নারী হলো শক্তিরূপিনী। এই যে তুই জাহাজে রাতে একা দাঁড়িয়ে থাকিস—সব এই ভগবতীর কৃপা-লাভের জন্য। বিগ বিগ আদর্শ মারাবি না। সীতা বলিস সাবিত্রী বলিস, সবারই সেই এক জায়াগায় দেবতাদের লোভ। কিরে, শেষ করে দিলি দু-চুমুকে! মরবি দেখছি!

অঞ্জন বলল, আচ্ছা সেনদা, সীতা কি সত্যি দুশ্চরিত্রা ছিল! রাবণের সঙ্গে কিছু যদি হয়!

সেনদা বলল, দেখ অঞ্জন, মাতাল না হয়ে মাতালের মতো কথা বললে পাপ হয়। সেনদা শিস দিল জোরে। এমন শিস যে সেই মেয়েটা দৌড়ে আসছে। সেনদা দুটো আঙুল ফাঁক করে দেখলে। মেয়েটা কাছে এল না। ইঙ্গিতে বুঝে নিয়েছে। সে আবার ট্রেতে নিয়ে এল। একই ভাবে হাঁটু মুড়ে বসল। ওদের হাতে তুলে দিল, আগের গ্লাস দুটো তুলে নিয়ে চলে গেল।

পার্কের আলোগুলো সব জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। আলো জ্বেলে দেওয়ার পরই গাছপালা, সবুজ ঘাসের মাঠ আর অতিকায় কৌরি পাইন গাছগুলি কেমন এক মায়াবী দেশের বাসিন্দা হয়ে গেল। নারী-পুরুষেরা সব তার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ঝোপে-জঙ্গলে চলে যাচ্ছে। সেই আদিম রিপুর তাড়না। ওরাও বসে থাকতে পারল না। বুড়ীর দোকানের সামনে গিয়ে হাজির হলো। ছোট লোহার গেট ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখল, উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীর ভিড়। তারা কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে ভাজা মাংসের সঙ্গে মদ খাচ্ছে।

অঞ্জন বলল, আমি আর খাব?

সেনদা ওর চোখ-মুখ দেখে বলল, না, তোমার পা টলছে। সতীপনা খুব দেখিয়েছ বাপ। আর বেশি খেলে মরবে। সেনদা এবারে কাউন্টারে ঝুঁকে বৃদ্ধাকে বলল, একটা এই যে, বলে সে তার নাতনিকে ইশারায় ডাকল। এবং কাছে এলে বলল, ওকে আর দেবে না। চাইলেও না।

আমি আর খাবই না। বলে অঞ্জন মেয়েটিকে কাছে ডেকে বলল, তোমার নাম কি?

মেয়েটির মুখে ফের মুচকি হাসি।

সেনদা বলল, এ-সব হলোগে মরদ মজানো হাসি। একদম ঘেঁষবে না। একে তুমি সীতা ভাবলে খুব খারাপ হবে।

যা বাব্বা, সীতা ভাবতে যাব কেন!

তবে ওভাবে মেয়েটাকে গিলছিস কেন! বুঝি না, অমন করে তাকাচ্ছ কেন! অঞ্জনের মাথার মধ্যে তখন কী যেন হচ্ছে। এই কি তবে মানুষের সব আকর্ষণের মূলে। ওর তখন সেনদাকে নিয়ে চলে যাওয়া উচিত। কারণ

সে জানে সেনদা থামবে না। যতক্ষণ না গড়াগড়ি খাবে ততক্ষণ চালিয়ে যাবে। বিপদ টের পেয়েও সে নড়তে পারছে না। কিংবা তার চলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সেনদা গেলে সে আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকার অনুমতি পাবে। পকেট হাতড়ে সে এখন নিজের পার্স থেকে টাকা বের করে বলল, আমাকে দাও। মেয়েটি খুব খুশি। সে গ্লাস আনতে ভিতরে ঢুকে গেল।

ওরা সেদিন বেশ রাত করে ফিরল। কিছুটা ট্যাক্সিতে এসেই নেমে পড়েছিল। জ্যোৎস্না উঠছে শহরে। তারা পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে নেমে গেল। গান গাইল—বাংলা গান, ও মন মাঝিরে তোর নৌকাখানা দে ছেড়ে! এমনই সব গান, কোনো গানই শেষ হচ্ছে না। গভীর রাতে সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় মনে হলো হড়কে পড়ে যাবে। কোয়ার্টারে মাস্টার ওদের হাঁকডাকে নেমে এসেছে। সে-ই তাদের তুলে নিয়ে গেছে।

ওঠার সময় অঞ্জন বলল, আমার আর দেখে ফিরতে ইচ্ছে করছে না সেনদা। ওকে না দেখতে পেলে মরে যাব।

জাহাজীরা সাধারণত একটু এমনিতেই বেহিসেবী হয়। সেনদার মাত্রাটা আর একটু বেশি। দু-তিন দিন যেতে না যেতেই পকেট গড়ের মাঠ। তারপর দু-এক দিন এটা-ওটা বেচে, এমন কি সে তার কোটখানাও কম দামে পুরনো বাজারে বিক্রি করে পয়সা সংগ্রহ করল। অঞ্জনেরও হাত খালি। টাকা তুলতে চাইলেই তোলা যায় না। এ-ভাবে পাঁচ-সাত দিন ওরা সেই পার্কটায় গেছে। বৃদ্ধার নাতনির সঙ্গে বেশ ভাবসাবও হয়েছে। অঞ্জন ওকে এখন চুকি বলে ডাকে। চুকি অবসর পেলেই অঞ্জনের দেশ-বাড়ির কথা জানতে চায়। চুকি বারবার একটা কথাই বলে, তোমার কষ্ট হয় না বাবা-মা ছেড়ে এত দূর দেশে চলে আসতে?

অঞ্জন তখন কেমন বোকার মতো হাসে।

জাহাজে মাল খালাস চলছে পুরোদমে। বিকেল হলেই ছুটি। তখন যে যেখানে খুশি যাও। রাতে কিংবা সকালে ফিরে এলেই হলো। অঞ্জন সেদিন একাই যাচ্ছে দেখে সেনদা অবাক হলো। বলল, পয়সা পেলি কোথায়?

অঞ্জন ঘাড় নেড়ে বলল, কোথাও না।

তবে যাবি কি করে?

কেন, হেঁটে।

পয়সা নেই, গিয়ে কি হবে?

অঞ্জন হাসল। হাসলেই বোঝা যায়, কোনো দুর্বিদ্ধি মাথায় এসেছে। কিংবা নেশা। এটা হয় জাহাজে থাকলে। মেয়েমানুষের নেশা ধরে যায়। তাদের দেখতে পেলেও অনেকটা নেশা কাটে। সেনদা জানে, অঞ্জন পার্কটায় গিয়ে শুধু বসে থাকবে চুকিকে দেখবার জন্য। সে বলল, আর খাস না। ওরা টাকা-পয়সাটা একটু বেশি বোঝে।

একদিন বিকেলে নেমে যাবার সময় সেনদাকে টা-টা করল অঞ্জন।

সেনদা ডেকে দাঁড়িয়ে বলল, কিরে, সীতা উদ্ধারে যাচ্ছিস!

অঞ্জন শুনতে পেল না। সে মিশন পার হয়ে পাহাড়ের উপত্যকায় হারিয়ে গেল।

অঞ্জন গিয়ে ওখানটায় বেহায়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক। পয়সা নেই জানলে চুকি তার দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে সেনদা দেখল, অঞ্জন বিছানায় নেই। বাথরুম যেতে পারে। সে উপরে উঠে দেখল, সেখানেও নেই। বঙ্কিম বলল, রাতে ফেরেনি।

দৌড়ে গিয়ে ইঞ্জিন সারেঙকে খবরটা দিল।—কী হবে। আর এ-সময়ই দেখল, অঞ্জন টলতে টলতে উঠে আসছে চোখ-মুখ ফোলা। ওকে কেউ মারধোর করেছে। না হলে গাল কেটে যাবে কেন।

অঞ্জন ডেকে দাঁড়াল না। সে সোজা ফোকসালে ঢুকে গুম হয়ে বসে থাকল।

বঙ্কিম, সেনদা, এবং অন্য সব ইঞ্জিন জাহাজীরা ঘিরে ধরল ওকে। বলল, কী হয়েছে। বল! চুপ করে আছিস কেন?

অঞ্জন বলল, কিছু না। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

সেনদা ফের সতর্ক করে দিয়ে বলল, বিদেশ-বিভুঁইয়ে কি শেষে মরবি! আবার যদি বের হবি, কাপ্তানকে বলব।

সেই বিকেলে অঞ্জন আর বের হলো না। মুখ-চোখ ফুলে আছে। দু'দিন যেতেই সে আবার ভাল হয়ে গেল। এবং অবাক, সে আবার বিকেলে নেমে যাচ্ছে। সেনদা কিংবা সারেঙের কোনো কথাই কানে তুলছে না।

সেনদা কেমন শঙ্কা বোধ করল। সেদিন রাতে না ফিরলে বঙ্কিমকে বলল, চল তো ও ওখানে গিয়ে কী করে দেখব। শত হলেও বার-চোদ্দ মাস একসঙ্গে আছে। কঞ্জুস হলেও বিবেক বলে কথা। বঙ্কিম বলল, চল, দেখে

আসি। আমার তো মনে হয় বুড়িটা ওকে কোনো তুকতাক করেছে।

ওরা গিয়ে অবাক। দেখছে, চুকির সঙ্গে সেও বুড়ীর দোকানে কাজ করছে। যেন এটা শুধু চুকির ঠাকুমার দোকান না, তার নিজের। সে-ই বরং কে কোথায় কী চাইছে, সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য রাখছে। সেনদা কাছে যেতেই দেখল, চুকি লজ্জায় পড়ে গিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। তবে মারলটা কে?

সেনদা ক্ষেপে গিয়ে বলল, বাজে য়ের আড্ডায় তুই ভিড়ে গেলি! মারধোর খেয়েও লজ্জা নেই!

অঞ্জন হঠাৎ কেমন রেগে গেল এমন কথায়। বলল, আজেবাজে বকবে না। যা জান না বলবে না, মিছিমিছি মানুষকে ছোট করতে নেই।

সেনদা আরও ক্ষেপে গেল। তোর লজ্জা করে না! পয়সা নেই পকেটে, এখানে এসে বসে থাকিস। হ্যাংলা ভাববে না! বাপ-মার দেশের নাম ডোবাচ্ছিস! বেহায়া আর কাকে বলে!

চুকি কিংবা তার ঠাকুমা কিছুই বুঝতে পারছে না কেন ধমকাচ্ছে! অঞ্জন কেমন অপরাধী চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বৃদ্ধা এগিয়ে এসে বলল, ও এখুনি যাবে। তোমরা জাহাজে যাও। আমি ওকে পৌঁছে দেব। চুকিও বের হয়ে এল। মাথা নিচু করে বলল, তোমরা ভেব না। আমরা বুঝিয়ে-সুজিয়ে জাহাজে দিয়ে আসব। আমরা ওকে সত্যি আটকে রাখব না।

চুকি এবং তার ঠাকুমা কথা রেখেছিল। জাহাজে পৌঁছে দিয়ে গেছিল অঞ্জনকে। তবে জাহাজ ছাড়ার দিন অঞ্জনকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেনদা, বঙ্কিম এবং জাহাজের সবাই জাহাজ ছাড়ার আগে চুকির কাছে গিয়েছিল। চুকির মুখ দেখে টের পেয়েছে, অঞ্জন সত্যি সেখানে যায়নি। নারীর এমন বিষণ্ণ মুখ সেনদা জীবনেও দেখেনি।

আশ্বিন ১৩৯১

নবপত্রিকা

জীবন

যশোধরা রায়চৌধুরী

সময় তোমাকে ঘাড়ে ধরে বলে
এক্ষণি লেখ আমাকে—আমার
যাবতীয় ঢং, যাবতীয় ত্রুটি
সময় তোমার চেপে ধরে টুঁটি

সময় তোমার যাবতীয় ঝুঁটি
নেড়ে দিয়ে বলে, নড়ে বসো দিকি
উথাল পাথাল করে দিয়ে বলে
নড়বড়ে করে যাব সব খুঁটি

ভালবাসা আর ঘৃণা এই দুই
নর্থ পোল আর সাউথ পোল দুটি!

মেঘ বৃষ্টির কাব্য

সায়ন তালুকদার

আমাদের যত আদর, সোহাগ, নদী
বাঁধভাঙা ওই পিয়াসী স্রোতজল
শরীর জুড়ে গল্পের খোঁজে যদি,
নামাও বারিষ, ব্যাকুল দাবানল।

চাঁদের গায়ে রেখে যাব ডাকনাম;
হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা লিখব তারায়
গোধূলি-ডাকে পাঠাব গোলাপী খাম,
তুমি মেঘ হলে, বাদল কোরো আমায়!

ছোটগল্প

বেঁচে থাকা মরে যাওয়া

অমর মিত্র

আমি নাকি বিপদে পড়তে পারি। আমার দোকানে আগুন লাগতে পারে। আমার মেয়ে নেই তাই রক্ষে, না হলে তাকেও তুলে নিয়ে যাওয়া হত। রেপ এখন জলভাত। একটা বাহিনিই তৈরি করা হয়েছে ধর্ষণের জন্য। কথাটা আমাকে গোবিন্দ সিং বলেছে। আমি বহুদিন ধরে জানতাম ওর নাম গোবিন্দ কুইলা। সিং হলো কবে? মিউনিসিপাল ইলেকশনের সময় শুনলাম ও গোবিন্দ সিং। নাম এফিডেভিট করে কুইলা থেকে সিং হয়েছে। আর সিং হয়েই ওর দাপট বেড়েছে। আগে কেমন চুপচাপ ঘুরত। সাতে পাঁচে থাকত না। ঠিক ওর বাবা চৈতন্য কুইলা যেমন ছিল। তবে রাতের দিকে একটু নেশা করে গান গাইতে গাইতে ফিরত। এবার মলে সুতো হবো, তাঁতির ঘরে জন্ম নেব...। কিছুই করে বলে জানি না। আমিও তো বলতে গেলে কিছু করতাম না। শুধু মিউনিসিপ্যালিটির মাস-মাইনের চাকরি সঙ্গে উপরি। গত পনের বছর একটা দোকান করেছি বাড়ির নিচের তলা থেকে লন্ড্রি তুলে দিয়ে। চা বিস্কুট মাখন, রুটি, কুড়মুড়, চানাচুর, কোল্ড ড্রিঙ্কস, গোপনে হুইস্কি, রাম। চালু দোকান। গোবিন্দ দুই সাগরেদ নিয়ে দোকানে এসে বলল, অনেকদিন হয়েছে, দোকান এবার তোমাকে ছাড়তে হবে মনাদা।

আমার এখন বয়স হয়েছে। বাসে বা পাতালরেলে সিনিয়র সিটিজেনের আলাদা। ট্রেনে শতকরা ৪০ টাকা ছাড়। আমার ছেলে থাকে আমার সঙ্গে, কিন্তু দোতলা বাড়ির দোতলায়। একতলায় দোকান এবং আমার বাসস্থান। বউ বেঁচে নেই। একটি বিধবা বউ আশ্রিতা। ছেলের সঙ্গে এই নিয়ে ঝুট-ঝামেলা চলছেই। বিধবা চামেলিকে সে তাড়াবেই। আমি বলি রাতে একা থাকতে আমার খুব ভয় হয়, তাড়াবি কেন?

আমি মনোরঞ্জন, আমার ছেলের নাম মনোময়। আমি মনাদা (সিনিয়র)। সেও মনাদা (জুনিয়র)। সে মিউনিসিপ্যালিটির ডেথ রেজিস্ট্রার। ব্রজবাবুর শ্মশানে বসে। শ্মশানের গায়ে আদি গঙ্গা। থকথকে ময়লায় ভরা কালো জল। কুকুর বেড়ালের মড়া ভেসে যায়। তার উপরে কাক ভ্রমণ করে সুখে। মনাদা সিনিয়রের সঙ্গে মনাদা জুনিয়রের ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। এই সময়ে গোবিন্দ সিং এল।

আমি বললাম, বসো গোবিন্দ।

গোবিন্দ বলল, হামি গোবিন্দ সিং, হামার এক বাত, আমি এখানে মাংসের দোকান দিব, চৈতন্য চিকেন সেন্টার, সি সি সি।

কোথায়? অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কেন এখেনে? গোবিন্দ দাঁত বের করে হাসল।

বেশ বেশ, ভালো ভালো, চন্দনের চিকেন সেদ্ধ হয় না ভালো, তুমি করো।

হামি গোবিন্দ সিং বলছি, হামার এক বাত, চিকেন সেন্টার হবেই।

তুমি তো কুইলা। আমি বলে ফেললাম আচমকা।

খামোশ। তড়পে উঠল গোবিন্দ, এখানেই হবে?

কোথায় হবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম উদ্বেগ নিয়ে।

এখেনে, এই সামনে। দোকানের সামনেটা দেখায় গোবিন্দ।

আমার মায়ের নামে দোকান। সেই এলোকেশী ভাণ্ডারের সামনেই গোবিন্দর চিকেন সেন্টার হবে তা বলল গোবিন্দ। দোকানের সামনেই গুমটি হবে। কী করে হয়? তাহলে আমার দোকানের মুখ ঢেকে যাবে। আমার দোকানে ঢুকতে পারবে না খদ্দের। গোবিন্দ বলল, এইটাই হবে।

আমি বললাম, হবে না।

গোবিন্দ বলল, হবে মনাদা, তুমি এই দোকান করতে পার না, এই দোকান ডাকুর ছিল, কুণ্ডু লন্ড্রি, তুলে দিয়েছ, এখন গরমেন্টের ফুটপাথে চিকেন সেন্টার হবে, ইয়েস করো নো করো, আমার কিছু যায় আসে না, নো করলে তুমি বিপদে পড়বে।

আমি বললাম, হতে পারে না।

হতে পারে। গোবিন্দ দাপটের সঙ্গে বলল।

আমি বললাম, থানায় যাব।

যাও থানায়, থানা পারমিশন দেওয়ায় এইটা হচ্ছে। গোবিন্দ সিগারেটের ধোঁয়া আমার মুখের উপর ভাসিয়ে দিল, ডেঞ্জার হয়ে যাবে মনাদা, তবু তোমার মেয়ে নেই, কিন্তু বিধবা চামেলি তো আছে, তুলে নিয়ে যাব, রেপ ব্রিগেডের হাতে পড়ে যাবে।

আমি চুপ করে থাকলাম। গোবিন্দ কি আমার সঙ্গে মজা মারতে এসেছে? আমার চালু দোকানের সামনে চিকেন সেন্টার! দু বছর আমি রিটায়ার করে টাকা পয়সা নিয়ে ঘরে এসে বসেছি। দোকান চলত টিমটিম করে। দোকানের কর্মচারী নিতু টাকা ঝাড়ত। আমি এসে নিতুকে তাড়িয়ে নিজে দোকানে বসি। গোবিন্দর সঙ্গে নিতু আছে নাকি? আমি জিজ্ঞেস করলাম, গোবিন্দ তোমার মাসি কেমন আছে?

নিতুর কথায় কেন মাসির কথা? গোবিন্দর মাসির নাম নীলিমা তুং। আমি নিতু বলতাম। নিতুর বিয়ে হয়েছে বজবজ। নিতুর সঙ্গে আমার ইয়ে হয়েছিল। নীলিমা তখন তার দিদির কাছে থাকত। সে কম দিনের কথা? ইতিহাস, ইতিহাস। একটা মানুষের জীবন একটা ইতিহাস। গোবিন্দ বলল, তুমি সাবধানে কথা বল মনাদা, নিতুকে তুমি হটিয়েছ, এখন ফল ভুগতে হবে।

হুঁ, নিতুকে আমি হটিয়েছিলাম। তখন আমার জমানা। নিতুকে নিয়ে ডায়মন্ডহারবার গিয়ে হোটেলে থেকেছি পর্যন্ত। সকালে গিয়ে বিকেলে ফেরা। দুই বউ তো থাকতে পারে না, তাই নিতুর বিয়ে হয়ে গেল বজবজ। গোবিন্দ তখন ছোট। গোবিন্দর বাবা চৈতন্য কুইলা আমাকে খুব শ্রদ্ধা করত, তাই নীলিমাকে আমার সঙ্গে ছাড়ত। গোবিন্দর মায়ের আপত্তি ছিল শুনেছি, কিন্তু কে শোনে। তখন আমার দাপট কী! চৈতন্যকে চাকরি করে দিয়েছিলাম মিউনিসিপ্যালিটিতে। মাসে মাসে মাইনে। কাজ আর কী, আমি যেভাবে যা বলি তা করে দেওয়া। উপরি টাকা কালেকশন। নীলিমার বিয়ে হয়ে গেলে চৈতন্যের চাকরি যায় মাসিক বরাদ্দর টাকা নিতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ায়। আমার কী? আমি কী করব চৈতন্য? সাবধান হবে তো, মাঝখান থেকে আমার মুখ পুড়ল। আমি তোমাকে ঢুকিয়েছিলাম চৈতন্য, আমার বদনাম হলো। আসলে তখন আর একজনকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। তখন আমার কত ক্ষমতা। গোবিন্দ তখন বালক। তার বাবা ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। আমি তো চাকরি খাইনি।

গোবিন্দ বলল, নিতুই চালাবে চিকেন সেন্টার।

মানে তোমার? কথা শেষ করতে পারলাম না। হঠাৎ আমার মনে কেন যে উনিশ-কুড়ির নীলিমা ভেসে এল এখন! আমি বললাম, নিতু আমার ক্যাশ ঝাড়ত, তোমার চিকেন সেন্টারের ক্যাশ কি পাবে তুমি?

একদম মিথ্যে কথা বল না মনাদা, আমার বাবাকে যেমন ফাঁসিয়ে চাকরি খেয়েছিলে, তেমনি নিতুকেও ফাসিয়েছিলে।

হুঁ। আমি নিতুকে খালাস করিয়েছিলাম জ্ঞানদাময়ী নারসিং হোমে। তারপর বজবজে বিয়ে। সে সব কথাও গোবিন্দ জানে? চুপ করে থাকলাম। গোবিন্দ সব জানে, জেনেই এসেছে। গোবিন্দ বলল, মনাদাকে আমি বলেছি, মানে তোমার ছেলেকে, মনাদা সায় দিয়েছে, নিতু তো কিছু করবে।

আমি বললাম, মনা সায় দিয়েছে?

ছেলেকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো মনাদা, মনাদা বলল, সত্যিই তো নিতুর কিছু হওয়া দরকার, চৈতন্য চিকেন সেন্টার।

আমি না পেরে বললাম, মহাপ্রভু চিকেন খেতেন না, নিরিমিষি ছিলেন।

গোবিন্দ বলল, তুমিই তো প্রভুর প্রভু, মহাপ্রভু, আমার বাবার চাকরি খেয়েওছিলে, তুমি সব খাও, নিতুকে ভি খেয়েছ, আমার বাবা চিকেন ভালবাসতেন, তাই তাঁর নামেই হবে।

গোবিন্দ আলটিমেটাম দিয়ে চলে গেল এক মোটর সাইকেলে দুই প্যাসেঞ্জার নিয়ে। কী স্পিড! আমি রাত্তিরে উপরে উঠে গিয়ে ছেলেকে ডাকলাম, তুই সায় দিয়েছিস?

মনা বলল, হ্যাঁ, ভালই হবে, তুমি খুব খারাপ হয়ে গেছ বাবা, এরপর তোমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে ওই চামেলিকে নিয়ে।

কী যা-তা বলিস, আমার বাড়ি, দরকারে তুই বেরিয়ে যাবি। আমি ক্রুদ্ধস্বরে বললাম।

মনার বউ বুলু তার স্বামীকে থামাতে চাইল, কী বলছ, বাবা আপনি নিচে যান।

মনা বলল, তুমি বুঝছ না, এরপর সব ওই বিধবাকে দিয়ে যাবে, ও কে, কেন থাকবে এবাড়ি, তিনদিন টাইম দিলাম।

নিরাশ্রয়, ওর স্বামী মিউনিসিপ্যালিটির রঙ মিস্ত্রি

ছিল, পড়ে গিয়ে মরে গেছে, সবই তো জানিস মনা।

মনা বলল, গোবিন্দকে আমি ফিট করেছি, তুমি ওই বিধবাকে তাড়াও।

তা কী করে হয়, আমার বুকে ব্যথা উঠলে কে তেল মালিশ করবে।

মনা বলল, কেউ না, তুমি ফুটে যাবে, আমি কালই চিকেন সেন্টার চালু করে দেব দোকানের ভিতরেই।

বুঝলাম। নাটের গুরু আমার ছেলে পুরসভার ঘাটবাবু। ঘাট মানে শ্মশান ঘাট। ব্রজবাবুর ঘাট। নিচে এসে মিস্ত্রির ৩০ বছরের বিধবা বউ চামেলিকে বলতে সে বলল, কত্তা তুমি তো খুন হয়ে যেতে পার।

তারমানে?

বেহালায় অমনি একটা হয়েছে, ছেলে আর ছেলের বউ মিলে মেরে দিয়েছে বুড়োকে, এখন এসব খুব হচ্ছে।

আমি চুপ করে থাকলাম। চামেলির মোবাইল বেজে উঠল। চামেলি নিয়ে বাইরে গেল। এমনি ফোন প্রায়ই আসে। চামেলির বর মরেছে সাত বছর। চামেলি মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করে, 'সে লোক কী করে উপর থেকে পড়ল বলো দেখি।'

আমি জানব কী করে? ভারা থেকে ফেলে দিইনি। ক্ষতিপূরণটা অবশ্য চামেলিকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলাম। কিছু দিয়েছিলাম, বাকিটা নিজে নিয়েছিলাম। চামেলির বাচ্চা আছে একটা। তার মায়ের কাছে থাকে। সে সপ্তাহে একবার যায়। সানডে। টাকা দিয়ে আসে। চামেলি ফোন সেরে ফিরে এসে বলল, আমার পাশবইয়ে যে সাতলাখ টাকা দেবে বলেছ, কবে দেবে?

দেব, ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচিওর করুক।

ও আর ইহ জীবনেও হবে না, কবে দেবে বলো। চামেলি চাপা গলায় হিসহিস করে বলল।

কেন তাড়া কিসের?

তুমি মরে গেলে আমার কিছুই জোটবে না। চামেলি বলল।

মরব কেন? আমি হাসলাম, মরার বয়স হয়েছে নাকি?

চামেলি বলল, মরার আবার বয়স হয়, আমার সোয়ামী লোকটা পঁয়তিরিশ বছরে মরে গেল, তুমার তো বাষট্টি।

আমি বললাম, সে তো অ্যাকসিডেন্ট।

তুমারও তাই হবে, তুমার ছেলে মনাদা তুমারে রাখবে না।

গা ছমছম করে উঠল। চামেলির চুল খোলা। লাল কালো ডুরে শাড়ির আঁচলে খসে যাচ্ছে প্রায়। চামেলি সোফায় বসে মোবাইল খুঁটছে। বলছে, আমার পাওনা মিটিয়ে দাও মনাবাবু, মনাদা তোমারে ইলেকট্রি চুল্লিতে ঢুকাল বলে।

মগের মুলুক, তোরে বলেছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

চামেলি বলল, বলেছে।

কবে বলেছে?

দশদিন আগে, বলেছে আমারে কাজটা করতে। চামেলি নিস্পৃহ গলায় বলল।

আমারে বলিসনি তো। জিজ্ঞেস করলাম।

বলব কেন, বললি তুমি ছাড়তে মনাদা?

এখন যে বললি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মনাদা বলল, আমি যদি না পারি ঘুমের ওষুধ চল্লিশটা খাওয়াতে, আমারে চলে যেতে হবে, তখন গোবিন্দ সিং ভার নেবে।

সত্যি বলছিস? আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

তুমি বুঝতি পার না মনাদা? চামেলি উদাসীন গলায় বলল।

কী করে বোঝব বল? আমি উদ্বিগ্ন গলায় বললাম।

চামেলি বলল, আমার লোকটাও বুঝতি পারেনি, কিন্তু মরে তো গেল।

দুর্ঘটনা। আমি নিম্নস্বরে বললাম।

এইডাও তাই হবে মনাদা। বিড়বিড় করল চামেলি। কিন্তু তার স্বামী পুরন্দর তো সত্যিই দুর্ঘটনায় মরেছিল। ক্ষতিপূরণ নিতে আসার আগে আমি চামেলিকে দেখিইনি। রঙ মিস্ত্রির বউকে দেখার কথাও নয়। চামেলি মাথা নাড়তে লাগল, না গো মনাদা, তুমিও জান আমিও জানি তার মরণ হতোই, বলো মনাদা জানি কি না?

আমি মাথা নাড়তে লাগলাম। কিন্তু চামেলি মানতে চাইল না। কথাটা সে আগে দুবার বলেছে। তিনতলার ভারা থেকে আচমকা পড়ে গিয়েছিল পুরন্দর। সামান্য তিনতলা। চামেলি বলল, আমার টাকা আমারে বুঝায়ে দাও, তুমি

মরে গেলে কি তোমার ছেলে বুকে তেল মালিশ করাতে রাখবে আমারে?

আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। চামেলি বলল, ঘুমের ওষুধ খাইয়ে তোমারে মেরে দেবার কথা ছিল মনাদা, কিন্তু কাজটা আমি করিনি, তাই আমারে তাড়াবে বলছে, একেবারে পাড়া ছাড়া করে দেবে, দরকারে তুলে নিয়ে গিয়ে...। চামেলি বলল, আমার টাকা আমারে দিয়ে দাও মনাদা, আমারে তিনদিন সময় দেছে উপরের মনাদা।

আমি বললাম, চামেলি তোর স্বামীকে আমি মারিনি, দুর্ঘটনা।

তার তো মরার বয়স হয়নি।

চামেলি বরং আমি তোরে নিয়ে কাশী চলে যাই, চামেলী, ও চামেলী।

মরণ! চামেলী মুখ ঘুরিয়ে নিল, তারপর বলল, তুমি বাদু চল আমার মায়ের বাড়ি, তুমি সেখেনে থাকবা, আমার মা আয়ার কাজ করত, তুমার সেবা করতে পারবে, আমি বরং সনাতনকে বিয়ে করে পাশেই থাকব মনাদা, বাঁচতি চাও তো...।

জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে তাকিয়েছি। সনাতন। লম্বা ঢ্যাঙা সনাতন দাস। হুঁ, আমি চিনি। আর এক রঙ মিস্ত্রি। তার সঙ্গেই তো বোরো অফিসে এসেছিল চামেলি। ঢলো ঢলো কাঁচা। সনাতনও ছিল সেদিন ভারায়। সে পড়েনি, পুরন্দর পড়েছিল। সনাতন বলেছিল, অনাথ বউ কিছু পাবে না গরমেন্টের কাছ থেকে?

আমি বলেছিলাম, তুই পড়লি না ও পড়ল কেন?

সনাতন চুপ করে ছিল।

পুলিশ এঙ্কোয়ারি করছে, বলেছি ভারায় আর কেউ ছিল না।

সনাতন মাথা নামিয়ে একেবারে চুপ।

বলেছিলাম, কিছু দেয়া যাবে, কিন্তু বউটা আমার ঘরে থাকুক, আমার কেউ নেই যে দুটো রেঁধে দেয়।

সনাতন বলেছিল, পারবে স্যার।

একা মানুষ আমি, কাজের হ্যাপা নেই, ছেলে উপরে থাকে।

ঠিক আছে স্যার। সনাতনই জবাব দিচ্ছিল চামেলির হয়ে। পুরন্দর মরতে সে-ই যেন চামেলির গার্জেন। আমি চামেলির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছি। এই দিনের জন্য অপেক্ষা করছিল চামেলি? সনাতনের হাত ধরতে এতদিন! ইহ জগতে কোনটা সত্যি, কোনটা সত্যি নয়, তা বলবে কে? বাঁচা মরা কার হাতে, মনাদার হাতে মনাদার, নাকি সনাতনের হাতে পুরন্দরের, কিংবা সবই দুর্ঘটনা?

পুরনো লণ্ঠন

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

মাটিতে ছড়িয়ে বসে ছুরি দিয়ে প্যাকেটটা কাটল পারমিতা। ভেতরে বাবল র‍্যাপ। সেটা খুলে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল লাল টুকটুকে লণ্ঠনটা। পারমিতা মুগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ লণ্ঠনটার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল। অনলাইনে অনেক সময় ছবিতে যা দেখায় জিনিসটা ডেলিভারি হওয়ার পর দেখা যায়, যা ভেবে অর্ডার করেছিল সেটা ঠিক মনের মত মিলছে না। কিন্তু এক্ষেত্রে উলটোটাই হয়েছে। ছবির চেয়েও সুন্দর টুকটুকে লাল লণ্ঠনটা।

এই লণ্ঠনটা অবশ্য সাবেকি কেরোসিন তেলের লণ্ঠন নয়। শহরে আজকাল আর কেউ লণ্ঠন ব্যবহার করেনা। লোডশেডিং ব্যাপারটাই নেই। বাড়িতে এমারজেন্সি লাইটের দরকার হবে মনে হলে কারো কারো ব্যাটারির আলো থাকে। এটা বাহারি সাজিয়ে রাখার লণ্ঠন। এর ভেতরেও অবশ্য একটা ব্যাটারি দেওয়া এলইডি আলো আছে। তবে সেটা আলো ছড়ানোর জন্য নয়। ঠিক তেলের লণ্ঠনের মতই হলদেটে একটা আলো বেরোবে। ভেতরে ছোট সার্কিট আছে। আলোটা দপদপ করে।

ব্যাটারিটা অবশ্য লাগানো নেই। সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে, লাগিয়ে নিতে হবে।

অনলাইনে মনের মতো জিনিস পেলে পারমিতা কিছুক্ষণ চোখের সামনে জিনিসটা রেখে পুট-পুট করে বাবল র‍্যাপ ফাটায়। মানসপটে দেখতে পায় জিনিসটাকে কোথায় সাজিয়ে রাখলে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে লাগবে। নতুন ফ্ল্যাটে এসে পারমিতা খুব খুশি। একেবারে মনের মতো স্বপ্নে দেখা ঝাঁ চকচকে ফ্ল্যাট। চকচক করছে গ্লসি আসবাব। ডিজাইনার সিলিং থেকে চুঁইয়ে পড়ছে মাপা উজ্জ্বল আলো। কত কত দিনের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে। রাতের পর রাত জেগে পারমিতা অনলাইনে ক্যাটালগ তৈরি করিয়েছে একেকটা ঘর সাজানোর জিনিসের। ডেলিভারি হওয়ার পর প্যাকেট খুলে একেকটা সাজিয়ে রেখেছে নির্দিষ্ট জায়গায়।

এই লণ্ঠনটাও একটা নির্দিষ্ট জায়গার কথা ভেবে কেনা। সামনের বারান্দায় একটা ছোট্ট কফি টেবল আছে। নীহারিকা বলেছিল ওই কফি টেবলের ওপর লণ্ঠনটা রাখতে। লণ্ঠনটা নিয়ে বারান্দার দিকে যাবে এমন সময়ে তমাল একটু অন্যমনস্ক হয়ে ঘরে ঢুকল। পারমিতার হাতে লণ্ঠনটা খেয়ালই করল না। পারমিতা গদ-গদ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেমন হয়েছে দ্যাখো।'

তমাল এক ঝলক দেখে দায়সারা উত্তর দিল, 'ভালো।'

'শুধু ভালো? কত কষ্ট করে খুঁজে পেয়েছি জানো?' পারমিতা লণ্ঠনটা ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে বলল।

তমাল একটু ভুরু কুঁচকে বলল, 'এই লণ্ঠনটা কোথায় দেখেছি বলত?'

'কোথাও দেখনি সেটা হলফ করে বলতে পারি। বহু খুঁজে আনলাইনে পেয়েছি। বললে না কিন্তু কেমন হয়েছে।'

'হুম, খুব সুন্দর হয়েছে।' তারপর নিচু গলায় বলল, 'কিন্তু আমার জিনিসটা যে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিনা।'

সবে দু-দিন হল এই ফ্ল্যাটে গৃহপ্রবেশ হয়েছে। এখনো ফ্ল্যাট ভর্তি বড় বড় প্যাকিং বাক্স সব খোলা হয়নি। এই ফ্ল্যাটের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন করেছিল নীহারিকা, মেয়েটা বারবার বলেছিল, 'ম্যাডাম, নতুন ফ্ল্যাটে শিফট করছেন, এত সুন্দর করে ইন্টেরিয়র করিয়েছেন, অকাজের জিনিস যত পারবেন ফেলে যাবেন।'

কোনটা কাজের জিনিস, কোনটা অকাজের সেটা বাছা রীতিমত ঝক্কির। তবুও গত এক সপ্তাহ পারমিতা অক্লান্ত চেষ্টা করেছে কোনো জঞ্জাল যেন নতুন বাড়িতে না আসে।

'তোমার কোন জিনিস খুঁজে পাচ্ছনা বলোতো?' পারমিতা জিজ্ঞেস করল।

তমাল পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তোমার সব প্যাকিং বাক্স খোলা হয়ে গিয়েছে?'

'না, দেখতেই তো পাচ্ছ। আরও দু-দিন লাগবে। কিন্তু তোমার কী খুঁজে পাচ্ছনা? আমি কিন্তু তোমাকে না দেখিয়ে তোমার একটাও জিনিস ফেলিনি। এমনকি তোমার স্কুলের জ্যামিতি বাক্সটাও।'

সাফাই করার সময়ে জ্যামিতি বাক্সটা পেয়েছিল পারমিতা। টিনের জং ধরা বাক্স। ভেতরে কম্পাসটাও

জং ধরে গিয়েছে। স্কেলে ফাটল ধরেছে, চাঁদাটায় লেখা আবছা হয়ে গিয়েছে। এই জ্যামিতি বাক্সটা আগে আলতো চোখে দুয়েকবার দেখেছে পারমিতা। একটা পুরনো জুতোর বাক্সের মধ্যে রাখা ছিল। বাক্সটা ধরে ফেলব ফেলব বলে ফেলা হয়নি। নীহারিকা ঠিকই বলে। এভাবেই আজে-বাজে জিনিস থেকে যায় বাড়িতে যার কোনো ঠিকানা থাকেনা, যার কোনো মূল্য নেই, ব্যবহার নেই। জুতোর বাক্সর মধ্যে শুধু জ্যামিতি বাক্সটাই ছিলনা। বেশ কয়েকটা অডিও ক্যাসেট ছিল। একটা পুরনো ক্যালকুলেটর ছিল। তার ব্যাটারিটা পর্যন্ত গলে গিয়েছে।

পারমিতা সবশুদ্ধ বাক্সটা তমালকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এগুলো এবার ফেলে দিই?'

তমাল কিছুক্ষণ চুপ করে বাক্সটার দিকে চেয়ে নিচু গলায় বলেছিল, 'থাক না।'

যথারীতি মনঃপূত হয়নি কথাটা পারমিতার কাছে। বলেছিল, 'কী হবে বলোতো এগুলো দিয়ে? জিনিসগুলো খারাপ হয়ে গিয়েছে সে কথা না হয় বাদই দিচ্ছি। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, কম্পাস তুমি এখন এর ব্যবহার করোনা। ক্যালকুলেটর তোমার মোবাইলের মধ্যেই আছে। আমাদের বাড়িতে আর কোনো ক্যাসেট প্লেয়ার নেই। দোকানেও এখন আর কিনতে পারা যায় কিনা সন্দেহ। বরং এইসব ক্যাসেটে যেসব গান আছে তার ছবি তুলে নাও। ইউটিউবে সব পাবে। নিজের একটা প্লে-লিস্ট তৈরি করে নিও। নতুন ফ্ল্যাটে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান মিউজিক সিস্টেম আছেতো।'

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে তমাল বলেছিল, 'স্মৃতি! এককালে এগুলো দিয়েই স্বপ্ন বুনতাম।'

পারমিতা জানে এই স্মৃতিই বড্ড ভয়ংকর জিনিস, পুরনো অকেজো বাতিল জিনিস ফেলে দেওয়ার প্রধান অন্তরায়। নিজের যুক্তি সাজিয়েছিল, 'দ্যাখো, অনেক স্মৃতি মনের মধ্যেই থাকা ভালো। এই যে জিনিসগুলো দেখছ, কী অবস্থা হয়েছে এখন, তোমার স্মৃতিতে কিন্তু জিনিসগুলো এরকম নেই। আমি অফিসে একটা হাউস কিপিং-এর কোর্স করেছিলাম। সেখানে বলেছিল খুব জরুরি কিছু কাগজপত্তর ছাড়া, যেসব জিনিস গত পাঁচ বছরে একবারও খুঁজে দেখার প্রয়োজন হয়নি, সেগুলো বাতিল করতে। তুমি ভেবোনা আমি এই জুতোর বাক্স ভরে রাখা জিনিসগুলো নিয়ে কোনো আপত্তি করছি। তোমার জিনিস, তুমি সিদ্ধান্ত নেবে। আমি শুধু ভেবে দেখতে বলছি। আমারও কত-কত জিনিস ফেলে দিয়েছি। এত খরচ করে আমরা শেষ পর্যন্ত মনের মতো একটা ফ্ল্যাট করেছি, দামি ইন্টেরিয়র করেছি, একেবারে সিলেক্টেড জিনিস থাকবে। আমি অনলাইনে একটা-একটা করে জিনিস কিনছি।'

চুপ করে তমাল শুনে বলেছিল, 'ঠিক আছে। ফেলেই দাও।'

'রাগ করছো কেন? তোমার জন্য একটা প্যাকিং বাক্স লেবেল করে রাখা আছে। তোমার কাজের জিনিস সব গুছিয়ে নিও ওর মধ্যে।'

আর কোনো আবেগকে প্রশ্রয় দেয়নি পারমিতা। ঢুকিয়ে দিয়েছিল জুতোর বাক্সটা জঞ্জাল ফেলার বস্তায়। এভাবেই নির্মম হয়ে পুরনো অকাজের জিনিস ফেলে এসেছে পারমিতা। হয়তো কখনও কখনও নিজেরও আপসোস হয়েছে কিছু ফেলে দেওয়া জিনিস নিয়ে, কিন্তু কঠোর হতেই হয়েছে। অনেকগুলো প্যাকিং বাক্স এসেছে পুরনো বাড়ি থেকে। তারমধ্যে তমালের একটা মাত্র বাক্স। জরুরি কাগজপত্তর, ফাইল সব নিজে গুছিয়ে নিয়েছে। নীহারিকা তমালের জন্য একটা খুব সুন্দর রোল অন চেষ্ট অফ ড্রয়ারস তৈরি করে দিয়েছে। নিজের প্যাকিং বাক্স খুলে তমাল নিজের হাতে সব গুছিয়ে নিয়েছে প্রথম দিনই। তমাল গুছনো মানুষ। দরকারি কাগজপত্তর থেকে শুরু করে নিজের প্রতিটা জিনিস এতটাই যত্ন করে গুছিয়ে রাখে যে চোখ বন্ধ করে খুঁজে নেওয়া যায়।

পারমিতা ঈষৎ ভুরু কুঁচকে তমালকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হারিয়েছ বলতো? বললাম না, তোমার একটা জিনিসও আমি তোমাকে না বলে ফেলিনি। বাকি তুমি নিজে হাতে গুছিয়েছ।'

'কোথায় যে গেল? এই কয়েকদিন আগেই দেখেছিলাম।' তমাল আনমনা হয়ে বিড়বিড় করে বলল।

'আরে বাবা জিনিসটা কী বলবে তো। তাহলে তো হেল্প করতে পারি।'

তমাল ফ্যালফ্যালে চোখে পারমিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দূরবীন।'

'দূরবীন? মানে বায়নাকুলার?' পারমিতা আশ্চর্য হল। তমালের সঙ্গে সংসার করার রজত জয়ন্তী বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কখনও কোনো দূরবীন যে তমালের আছে দেখেনি। পুরনো বাড়ির জঞ্জাল ফেলার সময় প্রতিটি জিনিস দেখেছে পারমিতা। তার মধ্যে কোনো দূরবীন ছিলনা। আর যদি থেকেই থাকত জ্যামিতি বাক্স বা ক্যাসেটের মতো

কোনো পুরনো দূরবীন, সেটা দিয়ে হবেটাই বা কি? মাঝে মাঝে জঙ্গলে ঘুরতে গেলে পশুপাখি দেখতে দূরবীনের দরকার হয়। সেসব গাইডদের কাছেই থাকে বা ভাড়া নিয়ে নেওয়া যায়।

'আমি কিন্তু কোনো দূরবীন গোছানোর সময় দেখিনি। কারো কাছ থেকে এনেছিলে রিসেন্টলি?'

ক্লান্ত মাথাটা নাড়ল তমাল, 'না। আমারই ছিল ছোটবেলার।'

'তোমার ছোটবেলার জিনিস?' আরও আশ্চর্য হল পারমিতা। তমালের ছোটবেলা যে বাড়িতে কেটেছে সেটা চোখেই দেখেনি। বিয়ের পর তিনবার ভাড়া বাড়ি বদলে অবশেষে বছর সাতেক আগে নিজেদের একটা ছোট ফ্ল্যাট হয়েছিল। তারপর সেই পুরনো ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দিয়ে এই নতুন বড় ফ্ল্যাটটা কিনে এনে উঠেছে। এতবার বাড়ি বদল হয়েছে। প্রত্যেকবার অনেক অনেক জিনিস ফেলে দিতে হয়েছে। বিশেষ করে এইবার। তমাল নিজের জিনিস নিয়ে এতটাই যত্নবান, সব গুছিয়ে এনেছে। কখনও কিছু হারায়নি।

তবে এই নতুন ফ্ল্যাটে আসার পর পারমিতা তমালের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। মানুষটা এমনিতেই খুব অন্তর্মুখী। নতুন ফ্ল্যাটে এসে যেন আরও চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। আসলে পুরনো ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে এই নতুন ফ্ল্যাট কেনায় প্রথমে খুব একটা সায় ছিলনা তমালের। পুরনো ফ্ল্যাটটার সঙ্গে একটা আবেগ জড়িয়ে ছিল। নিজেদের কষ্ট করে জমানো পয়সায় কেনা প্রথম ফ্ল্যাট। ওই পাড়াটা ছিল জমজমাট মধ্যবিত্ত বাঙালি পাড়া। আর এখনকার পাড়াটা একটা অভিজাত কমপ্লেক্স। কিছুটা যেন কৃত্রিম সাজানো গোছানো। এখনও সব ফ্ল্যাটে লোক আসেনি। পেছনের দিকে বিল্ডারদের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি।

প্রথমে সায় না থাকলেও, বাধা অবশ্য দেয়নি তমাল। পারমিতার কোনো ইচ্ছেতেই বাধা দেয়না তমাল। বরং নিজের মতটা বলার পর শেষপর্যন্ত পারমিতার ইচ্ছেটাই পূর্ন করে দেয়। তাই পারমিতা যে ভাবে চেয়েছে সেভাবেই খরচ করেছে। ফ্ল্যাটে সবকিছুই প্রায় নতুন। নীহারিকা কিভাবে ফ্ল্যাটটাকে সাজাবে তার পুরো পরিকল্পনা করার সময়ে বুঝিয়েছিল, কনসেপ্ট লিভিং এর কথা। পুরনো আসবাবপত্র সব বদলে ফেলতে হবে। মডিউলার কনসেপ্ট। মেয়েটা বুঝিয়েছিল ঘরের প্রতিটি ইঞ্চিকে কিভাবে দৃষ্টিনন্দন করে ব্যবহারযোগ্য রাখা যায়। ইউটিলাইজেশন অফ স্পেস। তাছাড়া আসবাবপত্রের নকশা এখন আমূল বদলে গেছে।

পারমিতার একটা স্বপ্ন ছিল ঠিক এরকমই ছবির মতো ফ্ল্যাট। সিনেমা টিভিতে এরকম ফ্ল্যাট দেখে কত যে চাপা শ্বাস ফেলে ভেবেছে, কবে এরকম একটা ফ্ল্যাট হবে। অবশেষে সেই সুযোগ যখন এসেছে, মনের সুখে আশ মিটিয়েছে। ঢেলে খরচ করতে হয়েছে এই ফ্ল্যাট করতে। তমাল একটুও কার্পণ্য করেনি।

'আমি কিন্তু সব প্যাকিং বাক্সের ক্যাটালগ করে এনেছি। কোথাও দূরবীন নেই। তোমার বাক্স তুমি নিজে গুছিয়েছ। আমি শুধু তোমার জামাকাপড়গুলো প্যাক করেছি। ওগুলো সব ওয়ারড্রোবে ঢুকিয়ে দিয়েছি।'

পারমিতা বারান্দায় এল। দুটো আধুনিক ইজিচেয়ার। মধ্যে কফি টেবল। কফি টেবলের ওপর লণ্ঠনটা রেখে আরেকবার মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল পারমিতা। এই নতুন জিনিসটা এবার উদযাপন করতে হবে। সেটা চা বা কফি ছাড়া হবেনা।

'শুনছো!' পারমিতা গলা ছাড়ল। তমাল কোনো উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

'চা না কফি?'

'উম!' তমালের অন্যমনস্কতা কাটেনি।

'কী খাবে, চা না কফি?'

'চা।'

'তুমি বসো। চা'টা করে নিয়ে আসি। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। পরশুর মধ্যে যদি সব গুছিয়ে ফেলতে পারি তাহলে শনিবার একটা হাউস ওয়ার্মিং পার্টি দেব। ছোট করে। গেস্ট লিস্টটা একটু ডিসকাস করে নেব।'

'খুব অস্বস্তি হচ্ছে জানো। দূরবীনটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনা।'

'উফ, তোমার মাথার মধ্যে কী যে ঢুকেছে, দূরবীন, দূরবীন। দ্যাখো তোমার কিছু একটা ভুল হচ্ছে। কোনো দূরবীন ছিলনা।'

'ছিল, ছিল।' আস্তে আস্তে তমালের গলাটা বুজে এল।

'আচ্ছা, তুমি অনলাইনে খুঁজে দেখো। ঠিক পেয়ে যাবে। এই যে এই লণ্ঠনটা দেখো। আমি মনে মনে এরকমই একটা লণ্ঠন ভেবেছিলাম। ঠিক পেয়ে গেলাম। কোনো দোকানে এরকম লণ্ঠন দেখেছ বলো? বসো, চা'টা করে

নিয়ে আসি। আরেকটা কাজ করে দাও না প্লিজ। লণ্ঠনটায় ব্যাটারিটা একটু লাগিয়ে দাও।'

পারমিতা উঠে রান্নাঘরে গেল। টিমেকারে চা করে ঝকঝকে কাচের কাপে নিয়ে এসে কফি টেবলের ওপর রাখল। বাইরে বিকেল মরে আসছে। সামনের দুটো লম্বা টাওয়ারের মধ্যে দিয়ে একফালি কমলা আলো বারান্দার একটা দেওয়ালে পড়ছে। নীহারিকার এই বাড়ির প্রতিটা ইঞ্চি মুখস্থ। এই পড়ন্ত বিকেলের রোদের ফালিটা পর্যন্ত খেয়াল করে বলে গিয়েছে, 'ম্যাম, এই দেওয়ালে একটা পেন্টিং লাগাবেন।' ছবির ফ্রেমের মাপও বলে দিয়েছে নীহারিকা। তবে ছবিটা এখনও পছন্দ করে কেনা হয়ে ওঠেনি। তবে ছবির বদলে এখন দেওয়ালে পড়ছে লণ্ঠনের ছায়া। সেটাও দুর্দান্ত লাগল পারমিতার।

তমাল একইরকম অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। লণ্ঠনটায় ব্যাটারি লাগানোর কথাটা যেন খেয়ালই করেনি। পারমিতা চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও। চা। আরে ব্যাটারিটা লাগিয়ে দিলে না?'

তমাল চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে একটু বিহ্বল চোখে পারমিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার কাপ'টা কোথায় গেল?'

'তোমার কাপ? কোন কাপ?'

'যে কাপটায় আমি খাই। খয়েরী রঙের।'

'ওফ! তুমিও না...ওটা তোমার পুরনো কাপ ছিল। ও-বাড়িতে।'

'কিন্তু কালকেই তো ওই কাপটায় চা খেলাম, আজ সকালেও।'

'অ্যাই, কী হয়েছে তোমার বলোতো? ওই বাড়ির থেকে কোনো চায়ের কাপ আনিই-নি। এই বাড়িতে আসার পর থেকেই তুমি এই কাপটাতে চা খাচ্ছ।"

'তাই! হবে হয়তো। খেয়াল করিনি।'

'তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'না এমনি। বুঝতে পারছি, পুরনো জায়গা ফেলে এলে একটু ক'দিন মন খারাপ করে। ঠিক হয়ে যাবে। এত কষ্ট করে করেছি আমরা এই ফ্ল্যাটটা, এনজয় করো। আমার তো খুব ভালো লাগছে।'

'আচ্ছা, ওই কাপটা কী হল? ফেলে দিয়েছ?'

'না ফেলিনি। নমিতাকে পুরনো ডিনার সেটটার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি। এই সেটটা ভালো হয়নি? দ্যাখো, কীরকম আনইউজাল শেপ।'

'অনলাইন?'

'হ্যাঁ, আবার কি? অ্যাই, তুমি কি আমার পেছনে লাগছ?'

'না, না। তুমি এক্ষুনি বললে না দূরবীনটার কথা। কিন্তু বিশ্বাস করো দূরবীনটা আমার ছিল। আমি আসার আগের দিনও ওবাড়িতে দেখেছি।'

'হতে পারে। এত জিনিস ঝাড়াই বাছাই করে এনেছি হয়তো ওভারলুক করে গিয়েছি। বাকি প্যাকিং বাক্সগুলো খুলি। হয়তো খুঁজে পেয়ে যাব। চা'টা খাও। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, কালকে কি তুমি বাড়িতে থাকবে?'

'না, আজ পর্যন্ততো ছুটি নিয়েছিলাম। কেন?'

'ডিশ ওয়াশারটা ডেমো দিতে আসবে। ঠিক আছে। আমি ম্যানেজ করে নেব। আচ্ছা, যে ইম্পরট্যান্ট কথাটা নিয়ে তোমার সঙ্গে ডিসকাসন করার আছে... শনিবার তাহলে ছোট করে পার্টিটা রাখি। আমি হেড ফিক্সড করে নিয়েছি। ষোলো। তার বেশি হলে গ্যাঁজাগেজি হয়ে যাবে। নতুন বাড়ি। লোকজনকে একটু স্পেসতো দিতে হবে সবকিছু দেখার। পরে একেকটা উইকএন্ডে নাহয় বাকি গেস্টদের ডাকব। এখন এই শনিবার তাহলে কাদের ডাকব? আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, তোমার অফিস, আমার অফিস...'

পারমিতার কথাগুলো ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকল তমালের কানে। পারমিতা কথা বলতে বলতে ভেতরে চলে গেল। বাইরে আলো জ্বলে উঠছে। উল্টোদিকের অনেক ফ্ল্যাটেই এখনো লোক আসেনি। কিছু কিছু ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। তমাল উদাস হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ মনে হল খানিকটা মেয়ানো আলো বারান্দার মেঝেতে ছড়িয়ে আছে।

কফি টেবলের ওপর চোখটা পড়তেই একটু বিস্মিত হল তমাল। লাল লণ্ঠনটার মধ্যে প্রদীপের শিখার মতো একটা এলইডি আলো দপদপ করছে। পারমিতা বলেছিল ব্যাটারিটা লাগিয়ে দিতে। লাগাব-লাগাব করে লাগানো আর হয়ে ওঠেনি। পারমিতাই হয়তো এক ফাঁকে লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। পায়ের কাছে কি যেন একটা চকচক করছে। একটু নিচু হয়ে জিনিসটা

তুলল তমাল। আরে এইতো সেই হারিয়ে যাওয়া দূরবীনটা।

'নীহারিকাকে আমি একশ'তে একশ দশ দেব। প্রত্যেকটা জিনিসের জায়গা কীরকম সুন্দর মাপে মাপে করেছে দেখে যাও। গ্রামাফোনের শো-পিসটা একেবারে সেট করে গিয়েছে। ওপর থেকে সিলিং লাইট-টা কি সুন্দর পড়ছে...' পারমিতা ভেতর থেকে নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছে।

তমাল দূরবীনটা চোখে তুলল। উল্টোদিকের ফ্ল্যাটগুলোকে দেখতে থাকল। ঠিক এভাবে দূরবীন দিয়ে অন্য লোকের ফ্ল্যাট দেখা নৈতিক নয়। হঠাৎ একটা অন্ধকার ফ্ল্যাটে চোখ আটকে গেল। নাহ, ঠিক অন্ধকার নয়। নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাটটার একটা ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। এইবার লণ্ঠনটা চিনতে পারল তমাল। বহুকাল আগে বাড়িতে এই লণ্ঠনটা ছিল। লণ্ঠনটার দুপাশে এক অল্প বয়স্ক দম্পতি মুখোমুখি বসে। আর কী আশ্চর্য তাদের চারপাশে ছড়ানো আছে পারমিতার বাতিল করে দেওয়া সব জিনিসগুলো।

ছেলেটা একটা সাদা কাগজ পেতে স্কেল কম্পাস দিয়ে নক্সা করছে। মাঝে-মাঝে ক্যালকুলেটরে কিসব অঙ্ক করছে। মেয়েটা একটা পুরনো ক্যাসেট প্লেয়ারে গান বাজিয়ে ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিল একটা খয়েরী কাপ। নক্সা দেখিয়ে ছেলেটা মেয়েটাকে কিছু বোঝাচ্ছে। মেয়েটাও খুব খুশি-খুশি মুখে উৎসুক হয়ে শুনছে।

'নাঃ! তোমার দূরবীনটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনা। চার নম্বর বাক্সটাও খোলা হয়ে গেল। তোমার কিছু মনের ভুল হচ্ছে মনে হয়।' ভেতর থেকে আবার পারমিতার গলা ভেসে এল।

ফিসফিস করে তমাল বলল, 'তাই হবে হয়তো। যে জিনিস যেখানে থাকার কথা সেখানেই থাকা ভালো। স্বপ্ন সব জায়গায় বোনা যায়না।'

ছোটগল্প

মেঘের ছায়া

ঋতা বসু

অদ্ভুত সমস্যা—

অস্বস্তিটা পুনাতে আসার পরেই শুরু হয়েছে এটা পরিষ্কার মনে আছে রণিতার। আগে কখনও হয়নি। প্রথমে মনে হয়েছিল জীবনে যে পরিবর্তনটা হল তারই ফল হয়ত অনেকেরই হয়। কেউ বলে না।তার বিয়েটার বয়স মাত্র দু-মাস। প্রেমের বিয়ে নয় অতএব একটি নতুন মানুষের সঙ্গে নতুন জীবন।এতরকম নতুনের সঙ্গে বাস করতে এল যে শহরে সেটাও একেবারে অচেনা। পুনার আবহাওয়া বেশ মনোরম কিন্তু বাকি সবই তো অপরিচিত।

কলকাতার শ্বশুর বাড়িটাও তো তার কাছে নতুনই ছিল। সেখানে কিন্তু কিছু মনে হয়নি।বাড়ির সবাই তাকে যথেষ্ট সমাদর করেছে।সেখান থেকেই হানিমুনে গিয়েছিল কেরালা। এত সুখ এত আনন্দ যেন দু-হাতের মুঠি থেকে উপচে পড়ছিল। নিরিবিলি চার দেয়ালের মাঝে শুধু সে আর প্রমিত এই ভাবনাতেই গায়ে সুখের পদ্মকাঁটা ফুটে উঠেছিল। পুনাতে এসে পাঁচ সাতদিন গেল জিনিসপত্র খুলে ফ্ল্যাট গোছাতে। এই আধুনিক আবাসন গুলোর সুবিধে হল সমস্তই পাওয়া যায় চৌহদ্দীর মধ্যে। সেভাবেই চলে এল দুধ, ডিম, আলু পেঁয়াজ সব্জীওলা ও কুন্তী বাঈ।

শাশুড়ি বলেছিলেন—মহারাষ্ট্রের বাঈরা খুব এফিশিয়েন্ট। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। প্রথম থেকেই রান্না-টান্নার কথা পরিষ্কার বলে নিও তাহলে কদিন বাদে যখন কাজে জয়েন করবে তখন আর অসুবিধে হবে না।

শাশুড়ির কথাটা যে কত সত্যি তা কুন্তী বাঈকে না দেখলে বিশ্বাস হত না।

কবে থেকে এটা শুরু হল রণিতা মনে করার চেষ্টা করছিল। পুনায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কখনওই নয়। তবে এক সপ্তাহ না দু সপ্তাহ সেটা গুলিয়ে গিয়েছে। শুরুটা এভাবেই হয়েছিল—শেষ বিকেলে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে একটা দমবন্ধ ভয়ের ভাব জড়িয়ে ছিল। রোদের উজ্জ্বলতা মুছে গিয়ে হালকা আঁধার জমেছিল ফ্ল্যাটের কোনে কোনে। এই ঘরেই কি খানিক্ষণ আগে ইউটিউবে গান শুনতে শুনতে নিশ্চিন্ত হাসিমুখে ঘুমোতে গিয়েছিল সে? এখানে আরও কয়েক ঘণ্টা একা থাকতে হবে মনে করেই তার মেরুদণ্ড দিয়ে ঠান্ডা জলের স্রোত বয়ে গেল।

কিছু না ভেবেই রণিতা ফোনটা হাতে নিয়ে ডায়ালও করেছিল। পর্দায় প্রমিতের হাসিমুখ কিন্তু কানে প্রমিতের অপ্রস্তুত কেজো গলাটা কানে যেতেই রনিতার সম্বিত ফিরেছিল।যতই তাদের নতুন বিয়ের ঢলো ঢলো ভাবটি বজায় থাক না কেন বিনা কারণে কাজ ফাঁকি দিয়ে বাড়ি চলে আসার জন্য এইরকম ছেলেমানুষী আবদার করা যায় না।

আসার সময় দোকান খোলা থাকলে নুডুলস এনো, এই জাতীয় হাবিজাবি কি একটা বলে সে ফোন রেখে দিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে গিয়েছিল। আবাসনের কেয়ারি করা বাগানের রাস্তা ধরে হেটে বাচ্চা বুড়োদের নানারকম কাণ্ডকারখানা দেখে দু-একজনের সঙ্গে ভদ্রতা সূচক দু-চারটে বাক্য বিনিময় করে ভেতরটা শান্ত হয়ে এলে পর পুরো ব্যাপারটা খুব হাস্যকর মনে হয়েছিল।

ফ্ল্যাটের কী হোলে চাবি ঢোকাবার সময় বুকটা একটু গুরগুর করেছিল কিন্তু ঢুকেই সমস্ত আলো গুলো জ্বালিয়ে দিতেই নিজের হাতে সযত্নে সাজিয়ে তলা ছোট্ট বাসাটার ওপর ভালবাসা যেন উপচে পড়েছিল। ওই বিকট অনুভূতিটা সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ এটাই মনে হয়েছিল। সেইজন্য এখনও পর্যন্ত প্রমিত দরকারের থেকে তাকে বেশি মনোযোগ দিলেও রণিতা কেন জানি না প্রমিতকে তার এই অস্বস্তির কথাটা বলে উঠতে পারেনি।

তারপর আরও তিন চারবার একই ঘটনা। গভীর ঘুমের মধ্যেও মনে হয় ঘরে যেন কারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।ঘুম থেকে ওঠার পরেও শরীর যেন দশমন পাথর বাঁধা আছে বলে মনে হয়। ফলে মনটাও বশে থাকে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেটে সামান্য কিছু কেনাকাটা করে চারপাশের চলমান জীবনটার অংশ হয়ে স্বাভাবিকতায় ফেরে।

কিন্তু কোথাও একটা ছন্দপতন আছেই।

ব্যাগে রাখা টাকার হিসেব মেলে না। সেদিন গলার

চেনটা হারালো। কখন? কি করে—সে জানে না। একটা আড়াই প্যাঁচের সস্তা আঙটি যেটা কুন্তীবাঈয়েরও নয়, পেল দরজার কোনে।

এটা কি ভুতুড়ে ফ্ল্যাট, নাকি কেউ তুকতাক করছে তাকে?কত অসম্ভব অবিশ্বাস্য কাণ্ডই তো ঘটে জীবনে। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? নেট সার্চ করে নতুন বিয়ের পর কি কি মানসিক পরিবর্তন ঘটতে পারে আর তার কারণ নিয়ে লম্বা লম্বা লেখা পড়ে মাথাটা আরও গুলিয়ে ফেলল। তিন চারদিন ভাল থাকে তখন মনে হয় তারা এত বেশি নেট ঘাটে আর গুগল সার্চ করে যে তিলকে তাল করা একটা অভ্যেস হয়ে যায়। এইরকম ভাল থাকতে থাকতেই আচমকা ফিরে আসে ভয়ের ভাবটা। ইদানীং ভয়টা আসবে ভেবেই সে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে থাকে। এমনকি আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয় এত তাড়াতাড়ি বিয়েটা না করলেই ঠিক হত।

রণিতার বিয়েটা হয়েছিল সম্বন্ধ করেই যদিও ইন্টারনেটে আধুনিক ঘটকালী করবার অনেক চেষ্টা হয়েছিল। রণিতার জন্য সম্বন্ধ খোঁজা হচ্ছে সেই খবরটা তাদের পাশের ফ্ল্যাটের বৌদি বেড়াতে এসে শুনলেন। তিনি তার জায়ের ছেলের জন্য প্রস্তাবটি নিয়ে ফেরত গেলেন। তারপর লক্ষ কথা খরচ করে দু-পক্ষই মনে করল এখানে সম্বন্ধ করা যেতেই পারে। প্রমিতের সঙ্গে তার আলাপ হল ফোনে। ভিডিও কলে বেশ কয়েকবার কথাও বলেছে তারা। প্রতিদিনই মেসেজ চালাচালি হয়েছে। তবুও এখন মনে হয় একটা পুরো মানুষকে চেনার জন্য সেটাই কি যথেষ্ট?

প্রমিতের কাজের সময়টা সত্যিই খুব লম্বা আর যেতেও হয় শহরের বাইরে অনেকটা দূরে ফ্যাক্টরিতে। সেই জন্য রাতে যখন ফেরে তখন ক্লান্তই থাকে। বন্ধুদের কাছে যেমন শুনেছে রাতের পর রাত চলে যায় কথা শেষ হয় না। তার বেলা ঠিক ততটা হয়নি। কিন্তু অল্পস্বল্প কথার মধ্যেই প্রমিতকে তার বেশ সজ্জন এবং কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন বলেই মনে হয়। অন্তত এখানে আসার আগে মন নির্মেঘ আকাশের মতই ছিল।

কলকাতায় রণিতা যে এন জি ও টায় কাজ করে তাদেরই একটি ছোট শাখা আছে পুনাতে। সেখানে রণিতার একটা জায়গা হয় কিনা তার জন্য মন্দাক্রান্তা বোস ওরফে এম চেষ্টা করছেন। একটু সময় লাগলেও সেখানে তার কাজটা হয়ে যাবে। তার আগে সকাল থেকে রাত এই নিরবচ্ছিন্ন আলস্য উপভোগ করবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে পুনা শহরে সে পা রেখেছিল এবং যে রকম ভেবে এসেছিল তার সেরকমটাই যে লেগেছিল সেটা স্বীকার করতে বাধা নেই। কিন্তু আচমকা এই অস্বস্তিটা তাকে বেজায় বিপদে ফেলে দিয়েছে। সে নিজেও বুঝতে পারছে না এটা তার সম্পূর্ণ মানসিক নাকি অন্য কিছু।

প্রমিত বেরিয়ে যায় খুব সকালেই। সেইমতই চলে আসে কুন্তী বাঈ। প্রথমেই সে ঝটিতি বানিয়ে ফেলে এখানকার ভাষায় যাকে বলে 'নাস্তা'। সেটা প্রমিত সঙ্গে নিয়ে যায়। নানারকম বাহারী পরটা বানায় কুন্তীবাঈ যার প্রেমে পড়েছে প্রমিত আর সে দুজনেই। দুপুরবেলা রায়তা দিয়ে সেটাই খায় রণিতা। বাড়িতে জলখাবারের পর্ব কলকাতার মতই। টোস্ট দুধ ডিম এগুলো টেবিলের ওপর গুছিয়ে দেয় রণিতা। ততক্ষণ রাতের রান্না ঘর ঝাট পাট, মেশিন থেকে কাপড় নিয়ে বারান্দায় মেলা, যন্ত্রের মত যাবতীয় কাজ নিখুঁত ভাবে সেরে দশটার মধ্যে চলে যায় কুন্তীবাঈ।

কলকাতার ঘাম গরমে অভ্যস্ত রনিতার পুনার এই নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বেশ লাগছিল। তার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিজের করে পাওয়া এই সংসার, নতুন পাওয়া স্বামী সামনে অনন্ত সম্ভাবনা,সবই তো চমৎকার ছিল।

শহরের এই দিকটা নতুন গড়ে উঠছে। চারিদিকে কত আবাসন। আরও কত তৈরি হচ্ছে। একটা ষোলো তলার ফ্ল্যাটে দাঁড়িয়ে রনিতা চারপাশটা দেখে ওপর থেকে। সত্যিই মনে হয় সারি সারি দেশলাই বাক্স। এই আবাসনগুলোর ভেতরে মোটামুটি সব ব্যবস্থা আছে। বাইরে না গেলেও চলে। একটা ছোট মন্দির, হাটার জায়গা, হাত বাড়ালেই ছুতোর প্লাম্বার কাজের মেয়ে সবই পাওয়া যায়। কলকাতায় সবাই চিন্তা করছিল সে একলা কি করে ম্যানেজ করবে এই নতুন শহরে। কিন্তু এত মসৃণভাবে সব হয়ে গিয়েছে যা সে কল্পনাও করেনি।

প্রমিত বেরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। তারও সংসারের কাজ সেরে বারান্দায় বসে অলস সকালটা ভালই কেটে যায়। সকালটা দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্লাম্বার ভাইয়ের বাইকে চেপে বেরিয়ে গেল কুন্তী বাঈ। এরপর আবাসনটাও ঝিমোবে বিকেল পর্যন্ত। শিকারের দিকে ওত পেতে বসে থাকা হায়েনার মত ভয়টা এগোচ্ছে গুড়ি মেরে।

কাল রাতে প্রমিতও বলছিল—তোমার সঙ্গে তো দেখাই হচ্ছে না ভাল করে। ছেড়ে দেব এই চাকরিটা।

তারপর যেন কি লক্ষ্য করে তার দিকে তাকিয়ে একটু চিন্তিত গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমার কি শরীর খারাপ?

রণিতা ব্যস্ত হয়ে বলেছিল—না না আমার শরীর খারাপ হবে কেন? অনেকক্ষণ তোমায় দেখিনি তো তাই শুকনো লাগছে।

তারপর তারুণ্যের যেমন স্বভাব ভালোবাসা আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল দুজন। একটা সুন্দর ঝর ঝরে মন নিয়ে রণিতার দিনটাও শুরু হয়েছিল। উঠেই কাজের তাড়ায় মনের অন্ধকার কাটাকুটিগুলোও মিলিয়ে গিয়েছিল। বারান্দায় হালকা মনে বসেছিল কফির কাপ নিয়ে। কিন্তু এখন আর ভাল লাগছে না।

অস্থির মন নিয়ে এমকে ফোন করে ফেলল রণিতা। মন্দাক্রান্তার ঘুম ঘুম গলাটা কানে যেতে তার সম্বিত ফিরল—স্যরি এম রিয়েলি স্যরি। একদম খেয়াল ছিল না আপনি এখন বিদেশে।

এম তাকে থামিয়ে শান্ত গলায় বলল—একটা সিরিয়াস কিছু না ঘটলে তুমি এমনভাবে ফোন করতে না। বল কি বলবে।

সিরিয়াস কি না জানি না—আপনি হয়তো হাসবেন। আসলে আমি এখনই কাজটা শুরু করতে চাই। আপনি যদি একটু বলে দেন।

—সে কি? তুমি তো বললে তিন মাসের একটা গ্যাপ চাও। ততদিনে আমিও এসে যাব। পুনায় গিয়ে তোমার নতুন সংসার দেখব সেইসঙ্গে তোমাকেও ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

—তিনমাস অনেক দেরী এম—আমি আর পারছি না। শিগগিরি একটা কাজের মধ্যে না ঢুকলে পাগল হয়ে যাব।

এম ওরফে মন্দাক্রান্তা বোস যিনি সারাজীবন শিশু আর নারীদের সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন, যাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট সমস্যা সমাধান করে কত মেয়েকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছেন। এক মুহূর্তেই তিনি বুঝে গেলেন রণিতা স্বাভাবিক নেই। কর্মজগতে তাড়াতাড়ি ফেরার ইচ্ছের থেকেও রণিতার গলার আওয়াজে বিপদসংকেত পেয়ে এম সতর্ক হয়ে উঠলেন। আজকাল প্রচুর খোঁজখবর করে বিয়ে হবার পরেও এতরকম গোলমাল হয়, মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যাচ্ছে। এম গলায় পেশাদারী কাঠিন্য এনে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে সমস্ত খুলে বল। যত ছোট ঘটনাই হোক কিছু বাদ দেবে না।

ইদানীং দুপুরের পর থেকে যে অস্বস্তি ভয় তাকে কাবু করে ফেলছে সমস্ত খুলে বলল রণিতা।

—প্রমিতকে বলেছ।

—না। ও যদি ভাবে এটা কোন অদ্ভুত সাইকোলজিকাল ডিসঅর্ডার, তখন কি হবে? সেইজন্য আমি শুধু ঘরে না থেকে দেখতে চাই কি হয়।

—সেটা নাহয় হল কিন্তু এরকম কেন হচ্ছে সেটাও তো জানতে হবে।

এরমধ্যেই এম ফোনটা ভিডিও মোডে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন। রণিতা তখনও বারান্দায় বসে। এম জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি বারান্দায় গাছ করেছ নাকি?

—না। এগুলো ছাদের টব। কার্নিশ থেকে লতিয়ে কিছুটা ঝুলছে। এটা তো টপ ফ্লোর কাঁচের দরজায় ছায়া পড়ে মনে হচ্ছে আমার বারান্দার গাছ।

—বুঝলাম।তা এখন তুমি কি করবে? লাঞ্চ হয়ে গিয়েছে?

—না।

—আজ আর ঘুম হবে না। আড্ডাটাই চলুক। তোমার ফ্ল্যাটটাও দেখা হয়ে যাবে।

বারান্দা থেকে রণিতা শোবার ঘরে ঢুকে এমকে ফোনটা ঘুরিয়ে দেখাল। এম বললেন—বাঃ খুব সুন্দর করে সাজিয়েছ।

ড্রয়িং ডাইনিং একইসঙ্গে। রান্নাঘরেও ছোটর মধ্যে আধুনিক সব ব্যবস্তাই আছে। এম সব দেখে বেশ সন্তুষ্ট হলেন। ডাইনিং টেবিলে ফোনটা ঠেস দিয়ে রেখে রণিতা মাইক্রোওয়েভে পরটা গরম করে খেতে বসল। আজ এম সঙ্গে থাকায় তার মনটা ভারি ফুরফুরে। কুন্তী বাঈয়ের পরটার কথা বলতে গিয়ে বলল—আর কিছু না হোক এম এই পরটা খেতে আপনাকে আসতেই হবে। আমি দুপুরে আর বাঙালিখানা খাই না। আজ খাচ্ছি পনির পরটা রায়তা দিয়ে।

—রায়তা নিয়ে যেতে প্রমিতের অসুবিধে হয় না?

—ও কলকাতার মিষ্টি দই ছাড়া খায় না। এদিকে কুন্তীবাঈ বলে পরটা খেতে হয় রায়তা দিয়ে। সত্যি দারুণ লাগে। আমার তো নেশা হয়ে গিয়েছে। এখানে টক দইটা

খুব চলে।

—রাতে কি খাও?

—ভাতডাল তরকারী মুরগির ঝোল এইসব।

—কুন্তীবাঈও খায় তোমাদের সঙ্গে?

—শুধু সকাল বেলার নাস্তা, এত্ত চিনি আর দুধ দিয়ে চা বানায়। সেটা দিয়ে পরটা খেয়ে আমার লাঞ্চ, রাতের রান্না সব টেবিলের ওপর গুছিয়ে রেখে চলে যায়।

রণিতার আজ ভারি ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে সঙ্গে কেউ আছে। এম জিজ্ঞেস করলেন—আঙটিটা কোথায় পেয়েছিলে?

রণিতা ফোনটা বারান্দা আর ঘরের লাগোয়া দরজার কোনটা দেখাল ফোনের ভিডিওতে। এম বললেন তোমার ফোনে কি সুন্দর মেঘের ছায়া পড়েছে। ছাদে ও কে? মালি নাকি? এত বেলায় কাজ করছে?

রনিতা ওপরে তাকিয়ে কারওকে দেখতে পেল না। সে বলল—মালি আসে সকালে। এ বোধহয় অবধেশ বিল্ডিং-এর প্লাম্বার। কুন্তীবাঈয়ের ভাই। এখানে এটা খুব সুবিধে। সব হাতের কাছে।

বলতে বলতে হাই তোলে সে—দুপুরে ঘুমের কি বাজে অভ্যেস হয়েছে দেখ সেইজন্যই তাড়াতাড়ি কাজে যোগ দিতে চাই।

এম বললেন—তুমি আমাকে আর একবার পুরো ফ্ল্যাটটা ভাল করে ফোনের ভিডিওতে ঘুরিয়ে দেখাও তো। ভুতুড়ে ব্যাপারটার রহস্য মনে হয় ধরে ফেলেছি।

রণিতার খুব ঘুম পাচ্ছিল। হাই তুলতে তুলতে এমের আদেশ পালন করে। রান্নাঘর ড্রয়িং রুম ঘুরে শোবার ঘর তার লাগোয়া বারান্দায় এসে একবারে নীচ আর ওপর পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে এম রায় দিলেন আজ তুমি শোবার ঘর আর বারান্দার মাঝে যে কাঁচের দরজা সেটা বন্ধ করে ঘুমোতে যাও। কাল প্রমিত অফিসে যাবার আগে আর একবার ভিডিও কল কোর। খুবই জরুরি।

সমাধান

পরদিন সকালে ফোনের পর্দাতেই এম আর প্রমিত প্রাথমিক পরিচয় সারা হল। তারপর এম বললেন—তোমরা দুজনে শোবার ঘরে এস। নিরিবিলি কথা বলা যাবে।

ঘরে আসার পর এম বললেন—রণিতা তোমার কাল কোন অসুবিধে হয়েছে?

—ভয় বা অস্বস্তি ছিল না। আপনার সঙ্গে কথা বলে ঘুমোতে গেলাম যে।

এম হেসে বললেন-সবটা ক্রেডিট আমার নয় কিন্তু। পুরোটা শুনলে বুঝতে পারবে।

প্রমিত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল—কিসের ভয় অস্বস্তি?

—সেটা তোমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারলে রণিতার সমস্যাটা কম হত। কিন্তু কিছুতেই পারেনি বলে মনের মধ্যে সেটা দম বন্ধ হয়ে আরও চেপে বসেছে। তবে ভয়ের ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই কাল্পনিক নয়। দেখ মহাকবি মাইকেলও বলেছেন, কপোত কপোত যথা উচ্চ বৃক্ষচূঁড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে। নবদম্পতির জন্য এই ফ্ল্যাটটা সত্যি খুব সুন্দর। কিন্তু টপ ফ্লোরের উচ্চতা ও নির্জনতার সুযোগ নিল আর কেউ। আমিও কাঁচের গায়ে ছায়া না দেখলে ধরতে পারতাম না।

রায়তা দেখলাম রণিতা ছাড়া কেউ খায় না তার মধ্যে কুন্তী মাঝে মাঝেই কিছু মিশিয়ে দেয়। তার জন্য গভীর ঘুম, ঘুমের পরেও হ্যালুসিনেশনের ভাব থাকে। কাল তো তোমার খাওয়ার পর ঘুম ঘুম ভাব দেখে আমি আরও শিওর হলাম। ছাদের কার্ণিশটা ঠিক তোমাদের বারান্দার ওপর। ওটা দিয়ে তোমার বারান্দায় যে কেউ আসতে পারবে, প্লাম্বারের কাছে তো জলভাত। কুন্তী কাজ সেরে চলে যায়। প্লাম্বার বলে ছাদে অবধেশের অবাধ যাতায়াত। এক ফাঁকে এই ফ্ল্যাটে ঢুকে কিছু হাতানো টাকা তো প্রায়ই গেছে। এইভাবে চেনটাও গিয়েছে। তুমি ভাবছ তোমার দোষ আর অপরাধবোধ আত্মবিশ্বাসহীনতা আরও চেপে ধরছে। এরা খুব চালাক। খুব সাবধানে অল্প অল্প করে সরায় যাতে ঠিক বোঝা যায় না কি হল। আমার ধারণা অবধেশের আরও বাড়তি কিছুর লোভও ছিল। এইভাবে গোপনে একেবারে শোবার ঘরে রণিতার অজান্তে ঢুকে পড়া,ঘুরে বেড়ানো, ঘুমন্ত প্রতিরোধহীন সুন্দরী নারীকে দেখা স্পর্শ করা তাকে অন্যভাবে স্যাটিস্ফাই করত। ঘরের মধ্যে অবধেশের এই অপ্রিয় উপস্থিতি অবচেতনে তোমাকে বিব্রত করত যার রেশ থাকত অনেকক্ষণ।

শুনতে শুনতে রণিতা শিউরে উঠলে পর প্রমিত তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বলে আমি তো কিছুই জানি না।

বলনি কেন আমাকে? আমি এখনই যাচ্ছি সেক্রেটারিকে বলছি গিয়ে।

এম হাত তুলে থামিয়ে বলে—তুমি এখনই কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। কুন্তীর আসা বন্ধ কর কাল থেকেই। বারান্দায় গ্রিল দাও। একা থাকলে সবসময়ে বন্ধ রাখ। কাল যে ভয় করেনি তার কারণ দরজা বন্ধ থাকায় অবধেশ ঢুকতে পারেনি। এরা দরজা ভেঙ্গে ডাকাতি করার টাইপ না হলেও অপরাধী বটে। আগে সমস্ত প্রিকশন নাও তারপর সময়মত সেক্রেটারীকে বোল। ইন ফ্যাক্ট বাড়ির নকশাটার জন্য ছাদ থেকে চলে আসা এত সুবিধে তাই সবার সেফটির কথা ভেবে টপ ফ্লোরের বারান্দাগুলোতে গ্রিল বসাতে বোল।

নির্জন চার দেয়ালের মধ্যে এখন শুধু প্রমিত আর রণিতা। প্রমিতের দু-হাতের নিরাপদ ঘেরের মধ্যে তার বুকের মধ্যে মাথা রেখে রণিতা তাকিয়েছিল বারান্দার দিকে। এখন আর একদম ভয় করছে না। কাঁচের দরজার গায়ে শুধু নীল মেঘের নিরীহ ছায়া।

বোঁ ভয়াজ

দীপান্বিতা রায়

শোনো, দরকারি কাগজপত্র, প্লেনের টিকিট সব দু-সেট ফটোকপি করে এনেছি। একটা সেট আমার কাছে থাকবে আর একটা স্যুটকেসে রেখে দেব। কোনও কারণে যদি একটা সেট হারিয়েও যায়, তাহলে অসুবিধা হবে না।

ফেরার টিকিটও একসঙ্গে রাখবে? ওটা আলাদা রাখলে ভালো হত না? যাওয়ার সময় তো আর রিটার্ন টিকিটের কোনও দরকার হবে না।

কে বলতে পারে, দরকার হবে না? ইমিগ্রেশনের লোকদের তো আর চেনো না। ওরকম তেএঁটে বদমাইস খুব কম দেখা যায়। স্যুট-বুট পরে বসে ঠাণ্ডা গলায় তোমাকে জেরা করবে। একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই অমনি ঢেঁরা পড়ে গেল। ঠাস করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে। তখন তুমি বেচারা ল্যাং ল্যাং করে আবার দেশে ফিরে আসতে বাধ্য। তাই অ্যাবসোলিউটলি নো রিস্ক। যদি ফেরার টিকিট দেখতে চায়, তাহলে অমনি স্যাট করে বার করে দিয়ে বলব, আমরা বাপু বেড়াতেই যাচ্ছি। তোমাদের দেশে থেকে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই। ছুটি ফুরোলেই বাড়ি ফিরব...

রিন্টির মা-এর ভুরুটা প্রথম থেকেই কুঁচকে ছিল। রিন্টি লক্ষ্য করল বাবার এতখানি ব্যাখ্যা শুনেও মা-এর ভুরু কিন্তু সোজা হল না। রিন্টির বাবা মানে অনুপম বোস সবে অফিস থেকে ফিরেছেন। এখনও জুতো ছাড়া হয়নি। লিভিংরুমে বসেই এইসব কথোপকথন চলছে। মা পর্ণা যদিও একঘণ্টা আগেই বাড়ি ঢুকেছেন, কিন্তু এখনও চা খাওয়া হয়নি। সেক্ষেত্রে এই কথোপকথনটা যেকোনও সময় বিপজ্জনক দিকে গড়িয়ে যেতে পারে সেটা রিন্টি জানে। টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রেখে সোফায় বসে থাকলেও তার কানটা তাই এদিকেই সজাগ ছিল।

কাগজপত্র যে তুমি নেবে বলছ, কী করে নেবে? তোমার তো কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো অভ্যাসই নেই।

বউয়ের কথা শুনে বিরক্ত হলেন অনুপম,

আজকাল তুমি কোনও কথাই মনে রাখতে পারো না বুবুন। সেদিন দেখালাম না, কোমরে আটকানোর একটা পাউচ কিনেছি। ওতেই সব কাগজপত্র, পাসপোর্ট সব থাকবে। বিদেশে গেলে কখনও পাসপোর্ট কাছছাড়া করতে নেই বুঝলে। নিজের গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে রাখতে হয়। পাসপোর্ট চুরি যাওয়া মানে একেবারে অথৈ জলে পড়া। তারপর সেই এমব্যাসি...

রিন্টির বাবার কথার তোড় মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে পর্ণা এবার কড়া গলায় বললেন,

পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে যে এমব্যাসি দৌড়তে হয় সেটা আমি জানি। সেজন্য অনেকে পাসপোর্ট চেনে বেঁধে জামার ভিতরে ঝুলিয়ে রাখে তাও জানি। এরমধ্যে একুশশো বার শুনে ফেলেছি। আমি যেটা জানতে চাইছি, সেটা হল ওইটুকু ব্যাগে তোমার এত কিছু আঁটবে?

আঁটাতেই হবে। ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। ওসব হল আমার ডিপার্টমেন্ট, তুমি শুধু একগাদা জামাকাপড় নিয়ে স্যুটকেসটা অকারণ ভারী করে ফেলো না। বিদেশে কিন্তু কুলি পাওয়া যায় না, নিজেদেরই স্যুটকেস টানতে হবে। একেবার হিজ-হিজ হুজ-হুজ ব্যাপার। আর শোনে জুতো নেবে কিন্তু ঠিক-ঠাক। হাঁটা-হাঁটি আছে। তোমাদের ওই পলকা চটি চলবে না। তুমি বরং...

বোমার পলতেয় আগুনটা প্রায় লেগেই যাচ্ছিল। সেই সময় কবিতামাসি চা-এর ট্রে নিয়ে ঢোকায়, রিন্টি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভুর-ভুরে দার্জিলিং চা-এর সুগন্ধে মা-এর ভুরু এতক্ষণে একটু সোজা হয়েছে। সঙ্গে বাটিতে ফুলের মত সাদা মুচমুচে চিঁড়ে-বাদাম ভাজাও আছে। তার মানে আপাতত ট্রুস।

তবে কদিন ধরেই বাড়িতে প্রায় সারাক্ষণই এরকম একটা ভয়ঙ্কর উত্তেজনার পরিস্থিতি চলছে। কারণ এবারের পুজোর ছুটিতে তুরস্ক বেড়াতে যাচ্ছে রিন্টিরা। রিন্টি এবং তার মা-এর এটাই প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। বাবা অবশ্য আগে কয়েকবার দেশের বাইরে গেছেন। একে তো প্রথমবার বিদেশ যাত্রা। তারপর আবার এমন একটা দেশ, যেখানকার ভাষা জানা নেই। স্বভাবতই রিন্টির মা চাকরি-বাকরি করা

হালু-চালু মহিলা হলেও যথেষ্ট টেনসড্‌। বিশেষ করে তাঁর টেনশন রিন্টির বাবাকে নিয়ে। কারণ মা-এর মতে ভদ্রলোক সবকিছুই অতিরিক্ত প্ল্যানমাফিক করতে গিয়ে ঘেঁটে ফেলেন এবং তাঁর কোনও সদুপদেশই সময়মত শোনেন না। রিন্টি এখন ক্লাস ইলেভন। সে ইতিমধ্যেই টার্কি সম্বন্ধে বেশ খানিকটা পড়াশোনা করে নিয়েছে। এমন একটা দেশ যার অর্ধেকটা এশিয়ায় আর বাকি অর্ধেকটা ইউরোপে, এটা জেনে সে রীতিমত উত্তেজিত। তারমানে এই টুরে ছোট্ট করে হলেও ইউরোপও তার দেখা হয়ে যাবে।

নানারকম আলোচনা, পরামর্শ, কেনাকাটা এসবের মধ্যে ঝড়ের মতো ক'টা দিন কেটে গিয়ে অবশেষে রিন্টিদের যাত্রা শুরুর মাহেন্দ্রক্ষণ এসে পড়ল। বাবার নির্দেশমতই জিনিসপত্র বেশি নেওয়া হয়নি। তাদের তিনজনের তিনটে চাকা লাগানো স্যুটকেস। মা-এরটা একটু বড়। কারণ তাতে সবার গরমজামা রয়েছে। মা-মেয়ের পায়ে হাঁটার উপযোগী নতুন গাবদা জুতো। বাবাও একই ধরনের জুতো পরেছেন। তবে তাঁরটা নতুন নয়। জুতো যেদিন কিনতে যাওয়া হল, সেদিন পর্ণা, অনুপমকেও একজোড়া কিনে নিতে বলেছিলেন। কিন্তু অনুপম মোটেই অকারণে পয়সা খরচা করতে রাজি হননি। কারণ তাঁর মতে জুতোটা একটু পুরোন হলেও যথেষ্ট শক্তপোক্তই আছে।

টার্কি বেড়ানোর ট্যুর চার্ট অনুপমই তৈরি করেছেন। এব্যাপারে পর্ণা নাক গলাননি। কারণ যে সামান্য দু-একটি বিষয়ে রিন্টির বাবার ওপর তাঁর আস্থা আছে, তারমধ্যে এটি একটি। টুর প্ল্যান অনুযায়ী, রিন্টিরা কলকাতা থেকে উড়ে গিয়ে প্রথমে নামবে তুরস্কের রাজধানী ইস্তানবুলে। তারপর সেই এয়ারপোর্ট থেকে অন্য একটা ফ্লাইট ধরে চলে যাবে দালামান বলে একটা জায়গায়। দালামান থেকে গাড়িতে ফেতিয়ে। সেখানে রাত কাটিয়ে, পরদিন সকালে শুরু হবে ইয়টে সমুদ্রযাত্রা। কলকাতা থেকে ইস্তানবুলের সরাসরি ফ্লাইট নেই। তাই রাতের প্লেনে দিল্লি গিয়ে, সেখান থেকে ভোররাতে টার্কি যাওয়ার প্লেন ধরতে হবে তাদের।

রাত আটটা নাগাদ প্লেন ছাড়বে। পুজোর কলকাতায় সবই খুব অনিশ্চিত। রিন্টিরা তাই যথেষ্টা আগে থেকেই বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। বাবার রীতিমত ফুর্তির মেজাজ। এমনিতে যতই টেনশন থাক, বেড়াতে যাওয়ার জন্য একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে মা-এর মেজাজও ফুরফুরে হয়ে যায়। কিন্তু এবার মা যেন একটু গম্ভীর হয়ে রয়েছে। হয়তো দেশের বাইরে যাচ্ছে বলেই ভিতরে ভিতরে নার্ভাস হচ্ছে, ভাবল রিন্টি। তাই ঘাঁটাল না মা-কে। সিকিউরিটি চেকিং করে ভিতরে ঢোকা হল। বিদেশযাত্রা। তাই বিমানবন্দরে বেশ কিছু কাগজপত্র দেখাতে হবে। লাইনে প্রথমে বাবা দাঁড়িয়েছে। তারপর মা। শেষে রিন্টি। কাউন্টারের ভদ্রলোক প্রথমেই পাসপোর্ট-ভিসা দেখতে চাইলেন। বাবার কোমরে আটকানো কায়দার ব্যাগে তিনজনের পাসপোর্ট রয়েছে। বাবা তাড়াহুড়ো করে চেনটা টেনে খুলতেই ঠাসঠাস ভর্তি ব্যাগের ভিতর থেকে তিনখানা পাসপোর্ট প্রায় লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল। ঠিক পাশের লাইনে দাঁড়ানো একটা দূরন্ত বাচ্চা এয়ারপোর্টের মসৃণ ভিট্রিফায়েড টাইলসে মনের সুখে পা ঘষে স্লিপ খাওয়ার চেষ্টা করছিল। তার জুতোশুদ্ধ পা-দুটি ধেয়ে আসছে দেখে, কোনওরকমে রিন্টির মা প্রায় উপুড় হয়ে পাসপোর্টগুলি রক্ষা করলেন। ভদ্রলোক অপেক্ষা করছে। তাই মা-এর অগ্নিদৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বাবাও খুব দ্রুত সেগুলি কাউন্টারের ওপাশে চালান করে দিলেন। সঙ্গে বিদেশযাত্রার টিকিট এবং অন্যান্য কাগজপত্র। কিন্তু তারপরেই ঘটল এক বিস্ফোরক ঘটনা। কাউন্টারের ওপাশের লোকটি চশমার ওপর দিয়ে বাবাকে খানিকক্ষণ জরিপ করে অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন,

এগুলো কী দিয়েছেন আমাকে?

কেন, আপনি যা চাইলেন, টিকিট আর....

এটা টিকিট! এতো আপনার ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন আর রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট...

বিদেশে ওষুধ কিনতে গেলে প্রেসক্রিপশন লাগে বলে সেটা সঙ্গে নেওয়া হবে ঠিক ছিল। আর অনুপমের সুগার লেভেল সামান্য ওপরের দিকে থাকে বলে, তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও সুগার টেস্টের রিপোর্টটা নিতে বলেছিলেন পর্ণা। কিন্তু সেসব তো স্যুটকেসে নেওয়ার কথা। কোমরের পাউচে তো থাকবে টিকিট আর পাসপোর্ট। টিকিট তাহলে গেল কোথায়? অনুপমের ভ্যাবাচাকা মুখ দেখে রিন্টি স্পষ্ট বুঝতে পারল, এযাত্রা আর তাদের টার্কি যাওয়া হচ্ছে না। এদিকে নিজের বাবার এমন বোকামির কথা তো বন্ধুদেরও বলা যাবে না। তাহলে পুজোর ক'টা দিন বাড়িতে লুকিয়ে বসে থাকতে হবে...আর ছবি, ছবি কী করে দেখাবে... আলোর গতিতে ছুটে চলা এসব চিন্তার মধ্যেই রিন্টি শুনতে বিপত্তারণ মধুসূদনের কণ্ঠস্বর।

এই নিন টিকিট...

পিন করা কাগজগুলো মা ঠেলে দিল কাউন্টারের

ওদিকে। গম্ভীরমুখে পরীক্ষা করে ছেড়ে দিলেন ভদ্রলোক। এয়ারপোর্টের চেয়ারে আবার যখন তারা এসে বসল, তখন বাবার গরুচোরের মতো মুখখানা দেখে প্রবল হাসি পাচ্ছিল রিন্টির। মা অবশ্য হাসাহাসির ধার দিয়েও গেলেন না।চেয়ারে বসেই বাবার হাত থেকে তিনখানা পাসপোর্ট প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে পুরে ফেললেন।

আমার পাউচটা কি তাহলে ফাঁকা থাকবে?

তুমি বরং ওখানে টুথপিক রাখো এক কৌটো। কাজে লাগবে। টিকিটের বদলে প্রেসক্রিপশন ঢুকিয়েছো! আর একটু হলে ট্যুর ক্যানসেল করে বাড়ি ফিরতে হচ্ছিল। নেহাত আমি তোমার ওপর ভরসা না করে একটা এক্সট্রা সেট ফটোকপি করিয়ে রেখেছিলাম তাই...

দিল্লি পৌঁছানো এবং সেখান থেকে ভোররাতে ইস্তানবুলের প্লেনে ওঠার পর্ব নির্বিঘ্নেই সমাপ্ত হল। প্লেন ইস্তানবুল এয়ারপোর্টে নামল সেখানকার সময় দুপুর দুটো নাগাদ। ঘন্টা দুয়েক পরে ওখান থেকেই দালামান যাওয়ার ফ্লাইট ছাড়বে। প্লেন থেকে নেমে জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য কনভেয়ার বেল্টের কাছে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তিনজনে। হঠাৎ এক বেশ দশাসই চেহারার সাহেব, তাড়াহুড়ো করে যাওয়ার সময় অনুপমকে ধাক্কা দিলেন। অনুপম পড়ো পড়ো হয়ে কোনওরকমে সামলে নিলেন ঠিকই কিন্তু রিন্টি অবাক হয়ে দেখল, বাবার পা থেকে সাদা চাপাটির মত কী একটা জিনিস খুলে বেরিয়ে এল। ব্যাপারটা পর্ণাও খেয়াল করেছেন এবং তাঁর দুই চোখ তখন বিস্ফারিতে। আর অনুপম তো ততক্ষণে প্রমাদ গণছেন, কারণ সাহেবের ধাক্কায় তাঁর ডান পা-এর জুতোর সোল খুলে বেরিয়ে গেছে। মোজার সঙ্গে জুতোর ওপরের খোলটি পরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

ইস্তানবুল এয়ারপোর্টটি বিশাল।তাতে চকোলেট, মদ, পারফিউম, গয়না থেকে শুরু করে হরেক জিনিসের অজস্র দোকান আছে। কিন্তু বহু খুঁজে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেও জুতোর দোকানের কোনও সন্ধান মিলল না। জিজ্ঞাসাবাদ করাটাও বেশ কঠিন।কারণ অধিকাংশ লোক ইংরাজি বোঝে না। তাই পা-এর জুতো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জুতো বোঝাতে হচ্ছে পর্ণাকে এবং পাল্লা দিয়ে রাগও বাড়ছে। সোলবিহীন জুতো পরে অনুপম বসে আছেন চেয়ারে। ইতিমধ্যে ছোটখাটো আরও একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। কনভেয়ার বেল্টে তাঁদের বড় স্যুটকেসটি, যাতে সব গরমজামা আছে সেটি এসে পৌঁছায়নি। বিমানবন্দরের লোকেদের বক্তব্য, স্যুটকেস হারাবে না। ফোন নম্বর দিয়ে যেতে হবে। এসে পৌঁছলে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হবে। তখন এসে নিয়ে গেলেই হবে। খুবই সুব্যবস্থা নিশ্চিত। শুধু আগামী পনেরো দিন তাঁরা কী জামা-কাপড় পরবেন সেটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। পর্ণা তাই চোখে যখন প্রায় সর্ষেফুল দেখছেন, তখন পরের ফ্লাইটের জিনিসপত্রের সঙ্গে কনভেয়ার বেল্টের ওপর দেখা গেল তাদের হারানো স্যুটকেস চুপটি করে বসে আছে। হারানিধি সংগ্রহ করে, জুতোর খোল পায়ে অনুপমকে নিয়ে বিমানে চড়ে বসল তিনজনে। পরবর্তী গন্তব্য দালামান।

ঘন্টা খানেকের প্লেন যাত্রা। ট্যুর প্ল্যান যেরকম আছে, তাতে এয়ারপোর্টে গাড়ি নিয়ে হুনায়েন নামে এক ভদ্রলোক আসবেন। তার নামটা হুমায়ুন না হুনায়েন তা নিয়ে রিন্টি আর তার বাবার মধ্যে আগেই বিস্তর তর্ক হয়ে গেছে এবং কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। যাই হোক্, এই হুনায়েন বা হুমায়ুনই বোসেদের পৌঁছে দেবেন ফেতিয়েতে। দালামান থেকে ফেতিয়ে বেশ খানিকটা দূরত্ব। গাড়িতে প্রায় ঘন্টা তিনেকের রাস্তা। তারমানে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। প্লেন যখন দালামান বিমানবন্দরের কাছে চলে এসেছে, তখনই পর্ণা জানলা দিয়ে দেখলেন বাইরে সন্ধে হয়ে এসেছে। আর আকাশে বেশ মেঘও রয়েছে। প্লেন ল্যান্ড করে ফোন খোলার অনুমতি পেতেই তাই অনুপমকে বললেন,

তোমার হুনায়েনকে একবার ফোন করে নাও। দ্যাখো উনি এসে গেছেন কিনা।

কোনও দরকার নেই। এরা আমাদের দেশের মত নয়। অত্যন্ত পাংচুয়াল। এক মিনিট এদিক-ওদিক হয় না। আমার সঙ্গে কাল রাতেও কথা হয়েছে। প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

পর্ণা তখন আর কথা বাড়ান না। কিন্তু প্লেন থেকে নেমে, জিনিসপত্র নিয়ে বেরোনর আগে আর একবার বলেন,

ফোনটা করে নিলে হত না? অচেনা জায়গা। গাড়ি এসে গেছে জানলে তারপর বেরোতাম। এয়ারপোর্টটা অনেক বেশি সিকিওরড্ জায়গা।

কিন্তু অতক্ষণ পায়ে শুধু জুতোর খোল পরে ঘুরে অনুপমের ততক্ষণে মেজাজ তুঙ্গে। তাই দুই ভুরুকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট বানিয়ে খেঁকিয়ে ওঠেন—

বললাম তো আসবে। বারবার একই কথা বলছ কেন? আর ফোন নম্বর তো পালিয়ে যায়নি, পকেটেই আছে। না এলে তখন ফোন করব।

অতএব জিনিসপত্র নিয়ে তিনজনে বেরিয়ে এল গেট দিয়ে। গেটের পরে একটা কাচে ঢাকা লম্বা টানেল। সেটা শেষ হচ্ছে একেবারে বিমানবন্দরের বাইরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। সেজায়গাটা একটু আধো অন্ধকার মত। কারণ রাস্তার আলো সম্ভবত জ্বলেনি। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তারমধ্যেই সামান্য একটু যে শেডে ঢাকা জায়গা সেখানে কয়েকজন ট্যাক্সি চালক দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের দু-তিনজনের হাতে প্ল্যাকার্ডও রয়েছে। তবে কোনওটাতেই অনুপম বোসের নাম লেখা নেই।

বিমানের বাকি যাত্রীরা সম্ভবত সবাই স্থানীয়। তাই তাঁদের গাড়ি এসে গেল এবং তাঁরা রওনা হয়ে গেলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু তুমুল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রিন্টিরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। রিন্টির হাতটা শক্ত করে ধরে পর্ণা কঠিন গলায় বললেন,

এবার কি তুমি ফোনটা করবে?

অনুপম নার্ভাস হয়ে এপকেট-ওপকেট হাতড়ে অবশেষে কোনওক্রমে ফোন নম্বর লেখা কাগজটা বার করলেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, নতুন কোনও মানুষের নাম এবং নম্বর, নিজের ফোনে সেভ করার ব্যাপারে অনুপমের বিলক্ষণ অ্যালার্জি আছে। সহজে করতে চান না। তার পিছনে যুক্তি হল, আজে-বাজে নামের লিস্টে নাকি ফোন ভরে যায়। এক্ষেত্রেও হুনায়েনের নম্বর তাঁর পকেটে ছিল, ফোনে নয়। নম্বর বেরোল। কিন্তু পড়া গেল না। কারণ এতই ছোট অক্ষর যে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের স্বল্প আলো এবং চালশের চশমা এই দুই-এ মিলে তা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। অতএব রিন্টির ষোল বছরের তাজা চোখের সাহায্য নিয়ে শেষপর্যন্ত চালককে ফোন করা হল। ফোন তিনি ধরলেনও। কিন্তু কথা কিছু বোঝা গেল না। কারণ যদিও তিনি ইংরাজিতেই কথা বলার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সেই ইংরাজি একবর্ণও অনুপমের মাথায় ঢুকল না।

এ লোকটা তো মনে হচ্ছে হুনায়েন নয়। হুনায়েন তো ভালোই ইংরাজি বলে, এর কথা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

অন্ধকার হয়ে গেছে। অচেনা দেশ। অচেনা ভাষা। সঙ্গে কিশোরী মেয়ে। পর্ণা বুঝতে পারছেন, ভয় তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে। অনুপমও বেশ খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেছেন। এয়ারপোর্ট থেকে বেরোনো যে উচিত হয়নি, সেটা ততক্ষণে তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে তখনও কয়েকজন ড্রাইভার যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। রিন্টিদের অবস্থা দেখে তাঁদের মধ্যেই একজন এগিয়ে এসে ভাঙা ইংরাজিতে কী হয়েছে জানতে চাইলেন। পর্ণার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অনুপম প্রায় খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো করে তাঁকে অবস্থাটা বোঝালেন। তাঁর অনুরোধে হুনায়েনকে আবার ফোনে ধরা হল। দুজনের স্থানীয় ভাষায় কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর জানা গেল, এই লোকটি হুনায়েন নয়। তাঁর ভাই। তিনি গাড়ি নিয়ে আসছেন। রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় দেরী হয়ে গেছে।

গাড়ি এসে পৌঁছল আরও কিছুটা পরে। ড্রাইভারের চেহারা খানিকটা ওলন্দাজ দস্যুদের মতো। তবে হাসিটি অমায়িক। বৃষ্টি তখনও জোরে পড়ছে। তারমধ্যেই কোনওরকমে গাড়িতে উঠেই অনুপম ড্রাইভারকে অতিকষ্টে বুঝিয়ে বললেন যে তাঁকে জুতো কিনতে হবে। রাস্তায় কোনও বাজার এলাকা পেলে যেন গাড়ি দাঁড় করানো হয়। বাজার এলাকা পেতে অসুবিধা হল না। কিন্তু জুতোর দোকানে ঢুকে বোঝা গেল, দোকানী তুর্কি ভাষা ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। ড্রাইভারের ইংরাজি জ্ঞানও যথেষ্ট নয়। অতএব ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের মতো ত্রিস্তরীয় কথোপকথন চালু হল। ফোনে ধরা হল হুনায়েনকে। অনুপম ইংরাজিতে তাঁরে বুঝিয়ে বললেন তিনি কী চান। হুনায়ুন সেকথা বললেন ভাইকে। ভাই আবার বললেন দোকানীকে। তবে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডের নিয়ম দেখা গেল পৃথিবীর সর্বত্র একরকম। তাই দাম মেটাতে কোনও সমস্যা হল না।

গাড়ি ছুটল ফেতিয়ের দিকে। অন্ধকার রাস্তা। কোথায় যাচ্ছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। অনুপম দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ফুরফুর করে নাক ডাকছে। রিন্টি ঢুলছে। পর্ণা শুধু অন্ধকার রাস্তায় জায়গার নামের গ্লো-সাইন দেখছেন আর গাড়ির আয়নায় ওলন্দাজ দস্যুর মুখটি দেখে তার মনের ভাব আন্দাজ করার চেষ্টা করছেন। এভাবে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কাটার পর দূরের আধো অন্ধকারে সার সার জাহাজের মাস্তুল চোখে পড়ায় হাঁফ ছাড়লেন। ফেতিয়ে সমুদ্র বন্দর। তারমানে গন্তব্য আর বেশি দূরে নয়।

রাতটা কাটল হোটেলে। পরদিন সকাল থেকে ইয়টে সমুদ্রযাত্রা। কিন্তু ইয়ট দাঁড়িয়ে আছে মাঝসমুদ্রে। ছোট্ট একখানা ডিঙিতে চড়ে সেখানে পৌঁছতে হবে।

অনুপম, পর্ণা কেউই সাঁতার জানেনা। তারওপর পর্ণা আবার মোটা মানুষ। অনুপমের অবিমৃশ্যকারিতাকে নানা রকম তীক্ষ্ণ বিশেষণে ব্যাখ্যা করতে করতে অতিকষ্টে স্যুটকেস সহ নৌকায় বসা হল। নানারকম কসরত করে ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে ইয়টেও উঠে পড়া হল। যদিও উঠে পড়া মাত্র সহযাত্রীরা সাবধান করে বলে দিলেন, ক্রমাগত বৃষ্টিতে কাঠের মেঝে ভয়ানক পিছল হয়ে গেছে। তাই এক্ষুণি জুতো খুলে ফেলতে হবে। না হলে স্লিপ করে রেলিং গলে সোজা সমুদ্রের জলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কথাটা শুনে ততক্ষণে আতঙ্কে পর্ণার প্রায় হাত-পা ছেড়ে যাওয়ার যোগাড়। মনে হচ্ছে বিদেশ ভ্রমণ মাথায় থাক, বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি। একে তো ইয়ট ভর্তি সব সাদা চামড়ার লোকজন। শুধু তারা তিনজন হল কালা আদমি। কী রকম ব্যবহার পাওয়া যাবে কে জানে! এদের সঙ্গ গা ঘেঁষাঘেঁষি করেই আগামী তিনদিন কাটাতে হবে।

জিনিসপত্র ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মাঝখানে একটা ডাইনিং রুমের মত জায়গা। বড় টেবিল পাতা আছে। ঘরে ঢুকে পর্ণা দেখলেন কয়েকজন বসে বিয়ার খাচ্ছে। আর এক কোণে একজন মাঝবয়সী শ্বেতাঙ্গ মহিলা কফির কাপ সামনে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে চেঁচাচ্ছেন। চেঁচামেচির মূল বক্তব্য হল বাথরুম এখনও ঠিক করে পরিষ্কার করা হয়নি এবং বেড লিনেন যেমনটি বলা হয়েছিল ঠিক তেমনটি নয়। এখনই ইয়টের ম্যানেজারকে বিষয়টি জানিয়ে সমাধান করা দরকার। যাঁর উদ্দেশে এই বাক্যবাণ বর্ষিত হচ্ছে, তিনি নিশ্চিত মহিলার স্বামী। একজন বেশ লম্বা-চওড়া সাহেব। তিনি একটি হাফপ্যান্ট পরে, মহিলার ঠিক পাশে বেঞ্চে পা তুলে বসে নির্বিকার চিত্তে বই পড়ে যাচ্ছেন।

গত দুদিনের নানারকম ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর এতক্ষণে একটু হাঁফ ছাড়ে পর্ণা। গায়ের রঙ কিংব গোলার্ধ আলাদা হতেই পারে। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র গিন্নিরা একই প্রজাতির জীব। অতএব নো চিন্তা। বোঁ ভয়াজ, বোঁ ভয়াজ।

খেলাঘরের মতো

রাজশ্রী বসু অধিকারী

অনেক ওপরের আকাশে, পাতলা মেঘের ছায়ায় ছায়ায় ডানা মেলে চক্রাকারে উড়ে যাচ্ছে ও কোন পাখি? ডানায় ভরে রাখা ঢেউ এর কনাগুলো ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে এদিকে ওদিকে হাওয়ায় হাওয়ায়! ও যে কোন দিকেই তো উড়ে যেতে পারে। কিন্তু যাচ্ছে না তো! শূন্যে একটা বৃত্ত তৈরী করে কেমন একলক্ষ্য হয়ে যাচ্ছে আমার সামনের আকাশে।

কিন্তু আর কি ওই আকাশটাকে আমার আকাশ বলে ভাবা যাবে? আর কতক্ষন সময় যেন রয়েছে আমার হাতে? এই ঘর এই জানলা এই আকাশ সবকিছুকেই আমার বলে ভাবার তীব্র অভ্যাসটা আর কতক্ষন যাপন করতে পারব আমি? আমার বলে কিছুই থাকবেনা আর এরা? এই জানলা আমায় ভুলে যাবে, এই আকাশ আমায় ভুলে যাবে। ওই বড় বড় সবুজ পাতায় মায়াবী সকাল দুপুর সন্ধ্যে জড়ানো গাছগুলো? ওরাও আমায় ভুলে যাবে? আর কতক্ষন পর থেকে যেন? আরো একটু ছুঁয়ে দেখব নাকি ওদের? আরো একটু স্পর্শ রেখে যাব? কিন্তু সত্যিই আমায় চলে যেতে হবে? এ কি সত্যি? নাকি দুঃস্বপ্ন? আমার এতবছরের লড়াই? আমার পরাজয়ের মরুভূমিতে গড়ে তোলা জয়ের ইমারত? আমার রাতজাগা স্বপ্নধোয়া রঙ এর মিছিল? স্তূপীকৃত সিল্ক খাদি তাঁত তসর জামদানি লিনেন স্বপ্নসমুদ্র? কি করব এগুলো? ফেলে দেব? পুরিয়ে দেব? বস্তাবন্দী করে আবার নিয়ে যাব কোন ভাড়ার গোডাউনে?

''দিদি, এইভাবে দাঁড়িয়েই থাকবে তুমি? এখনো কিছু করবে না? এই নাও, ফোন কর...'' অনিমা পেছন থেকে মোবাইল এগিয়ে দেয় পর্ণার দিকে। জানলার গ্রীলে গাল ঠেকিয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে পর্ণা সকাল থেকে। এরমধ্যে দুবার খাওয়া হয়ে যায় ওর। হয়ে যায় একটা পঁচিশ মিনিটের ভিডিও শ্যুট। তারপর আছে অনলাইন মাল ডেলিভারির হিসেব নেওয়া, ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম। তারই মধ্যে নতুন মালের অর্ডার দেওয়া, নতুন এসে পৌঁছোন শাড়ীগুলোর ডিসপ্লে প্ল্যানিং এবং কাস্টমার সামলানো। সবমিলিয়ে পর্ণার এই মাধুরী বুটিক জমজমাট থাকে সারাক্ষন। সেইসঙ্গে তাল মেলাতে অনিমা রুমা সুরেশ আর অনন্তকাকুর হিমসিম অবস্থা। আজ রুমা আর সুরেশ এখানে নেই। কয়েকমিনিট দেরী করে ফেলায় ওরা ঢুকতেই পারেনি ভেতর পর্যন্ত। অনন্তকাকু আর অনিমা এসে গিয়েছিল আগেই। তাই ওরাই রয়েছে পর্ণার পাশে। কিন্তু এ কোন পর্ণা! একে তারা চেনে কি? সেইসকাল থেকে যে শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়েই থাকে ঘণ্টাভর? ওদের চেনা পর্ণা তো সারাক্ষণ ময়ূরীর মতো নাচের ছন্দে হেসে খেলে কাজ করে বকুনি দিয়ে গান করে ফোন করে মাতিয়ে রাখে এই বাইশ শ' স্কয়্যার ফুটের ফ্ল্যাটের ভেতরের মাধুরী বুটিক। আজ সেই মানুষ কেমন স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সকাল থেকে। অনন্তকাকু কোঁচকানো চোখের কোলে জল নিয়ে বলে, ''যেদিন বৌদি চলে গেল সেইদিনও খুকীকে এত ভাঙ্গতে দেখিনি!''

''আজকেও ভেঙ্গে পড়ে থাকলে চলবেনা কাকু। আমি দিদিকে কিছু খাইয়ে আসছি।'' পাশ দিয়ে কফি আর বিস্কুট নিয়ে যেতে যেতে বলে অনিমা। তারপর ভেতরের ঘরে এসেই আবার বলে ওঠে, ''এ কি! তুমি আবারও সেই ফোন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছো? ফোনটা কর। চুপ করে ভাবতে থাকলে চলবে? কিছু তো করতে হবে! সাহেবও তো এলেন না একবারও। ডেকেছিলে?''

''ফোন করে কোন লাভ নেই'' ক্লান্ত অবসন্ন গলায় বলে পর্ণা। সেই উড়তে থাকা পাখীটা কোথায় কোনদিকে চলে গিয়েছে, আর তাকে দেখা যাচ্ছেনা। পর্ণা লম্বা গোলাপী সুদৃশ্য কাউচের একপাশে বসে পড়ে। এটার দাম প্রায় দেড় লাখ মত ছিল। ভীষন সুন্দর দেখতে। খুব শখ করে কিনে আরো সুন্দর করে সাজিয়েছিল পর্ণা। এখন কোথায় রাখব এটাকে? বেলঘরিয়ার? তিন কামরার ফ্ল্যাটে? ওটা বাবার সম্পত্তি। ওখান থেকে ও চলে এসেছে আজ পাঁচ বছর আগে। ওখানে গিয়েই যে কখনো উঠতে হতে পারে তা তো স্বপ্নেও ভাবেনি। ওই পরিবেশ থেকে তো ও নিজে বরাবরই আলাদা ছিল। সেই আলাদা হওয়ার জন্য ওকে সারাজীবন ধরেই তো মূল্যও কম চোকাতে হয়নি।

এই এতবড় এত দামী কাউচটা কেন কিনেছিলাম

আমি? কোন তো দরকার ছিলনা। বুটিকে যারা আসে তারা কেউ থাকতে তো আসেনা। আমারও বা কি প্রয়োজন ছিল এত বেশী খরচ করে এমন একখানা ড্রয়িং এরিয়া সাজানোর যেখান থেকে হাত বাড়ালেই আকাশ ছোঁয়া যায়? যদি জানতাম সেই আকাশটা চিরকালীন নয়, যে কোন সময় সেই আকাশের গায়ে ঢাকা পড়ে যেতেই পারে কালো পর্দার আড়াল, তবে নিশ্চই এত এত বাজে খরচ করতাম না আমি। পর্ণা বসে বসে ভেবেই যায়। এখনো শুধু ভাবে। অনিমা কত কি বলে যাচ্ছে, একে ফোন কর, তাকে ফোন কর ইত্যাদি। কিছুই কানে যাচ্ছেনা পর্ণার।

নিরূপমের সঙ্গে যেদিন শেষ দেখা হল কোর্টে, যেদিন দুজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম মতের মিল হলনা তাই বিচ্ছেদ চাইছি,সেদিনও কি এই শূন্যতা ছিল বুকের ভেতর? পর্ণা নিজের মনের মধ্যে হাতড়ায়। অনিমা জোর করে হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দিয়ে গেছে। একটা বিস্কুটও খেতেই হয়েছে ওর তাড়নায়। এখন অত প্রিয় কফিটা মনে হচ্ছে পানসে গরম জল। যে কোন জিনিসেই মন না থাকলে স্বাদ থাকেনা। মা বলত প্রায়ই। নিরূপমের সঙ্গে বিয়েটাতেও মন ছিল না বোধহয় দুজনেরই। তাই বছর ঘুরতেই বিস্বাদ প্রানহীনতা প্রকট হয়ে উঠল। ফলস্বরূপ মিউচুয়াল ডিভোর্স। সেদিন বাড়ী ফিরেছিল যন্ত্রের মত। বাবাকে মাকে একবারও দোষারোপ করেনি ওর মত একজন স্বাধীনচেতা মেয়েকে প্রায় ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং করে নিরূপমের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য। ওদের দুজনের মধ্যে এতটুকু মিল ছিলনা যা দিয়ে সংসার টেনে নিয়ে যাওয়া যায় এমনকি জোড়াতালি দিয়েও। শুধু বাইরের চকচকে সব কথা শুনে আর ডিগ্রী দেখেই বাবা মা ওকে পছন্দ করে ফেলেছিল। পর্ণার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্নটা কোন গুরূত্বই পায়নি।

''খুকু, সাহেবকে একটা ফোন করবে? নিচে কারা সব জমা হয়েছে। '' অনন্তকাকু এসে কথাগুলো বলে দাঁড়িয়ে থাকে অপরাধীর ভঙ্গীতে। যেন যা কিছু ঘটছে সব তারই জন্য। পর্ণা একচুমুকে ঠান্ডা কফিটা শেষ করে। উঠে দাঁড়ায়। একবার জানলার কাছে যায়। একবার র‍্যাকের ওপর টাল দেওয়া শাড়ীগুলোয় হাত বোলায়। এগুলো সব মাইশোর সিল্ক। মাত্র গত সপ্তাহেই এসেছে। এই শাড়ীগুলোর একটা ভিডিও করার কথা ছিল এই শনিবার। সেটা আর হবে কি?

''আচ্ছা অনন্তকাকু, তোমার মনে আছে এই বুটিক খোলার পর পর আমরা দু'জনে গিয়েছিলাম জঙ্গীপুর? তসর আনতে? ওখানে কিছু জায়গায় তসর শাড়ি তৈরি হয়..., হ্যাঁ মনে পড়েছে, মীর্জাপুর..., ইসলামপুর ...। তাই তো?''

''খুকু, আমি বলছিলাম যে সাহেবকে...''

''ফোন করে কোন লাভ নেই অনন্তকাকু। করেছিলাম অনেকবার। সে আসবেনা ...''

''তাহলে?'' এবার অনন্ত শুকনো চোখে ভাষাহীন তাকায়। তারও যে বৃদ্ধবয়সের বাঁচার অবলম্বন এই বুটিক। শুধুই তো খাওয়া পরা নয়। সেরকম কাজ তো পাওয়াই যায়। এখানে যে নিত্যদিন রঙ এর উৎসব, বাঁচার উৎসব। খুকুকে হাতে করে বড় করেছে সে, মেয়েটা নিত্যদিন মনের আনন্দে পেখম মেলে দেয় প্রতি স্কোয়ার ফুট জমিতে। তা দেখার সুখ নেই? এই রঙ আর কোনখানে মিলবে?

মা বুঝত পর্ণা আর পাঁচজনের মত নয়। ও নিজে কিছু করতে চায়। খুব গোপনে মা চাইত পর্ণা নিজের শর্তে বাঁচুক। কিন্তু বাবার সামনে মা ভীরূ হয়ে থেকে গিয়েছিল। পর্ণাকে বিয়েটা তাই করতেই হল কলেজ পাশ করার পর পর। টিকলনা বিয়ে। মনে আছে বাবা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিল ওর ডিভোর্সে। কিন্তু মা কি একটু খুশি হয়নি? তাই যেন মনে হত পর্ণার। এই বুটিক খোলার পেছনে মায়ের গোপন ভূমিকা তো ছিলই। সুরিন্দরের সঙ্গে আলাপ একটা বিয়েবাড়ীতে। সেই আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা। ওরা জাত ব্যবসায়ী। সুরিন্দর কাপুরের রয়েছে হাজারটা ব্যবসার অভিজ্ঞতা। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই পর্ণার এই ব্যবসার পরিকল্পনা।

''কিন্তু বুটিকটা খুলব কোথায়? ঘরভাড়া দিতে পারলেও সেলামীর যা বহর, পারবনা দিতে...'' চিন্তিত মুখে বলেছিল পর্ণা।

ফোনের ওপারে দরাজ হাসি সুরিন্দরের, ''আমি একটা ভাল প্রোপোজাল দিতে পারি। কিন্তু ফোনে হবেনা। আমাকে ডিনারে ইনভাইট করূন তাহলে...''

ভারী সুন্দর সুঠাম চেহারার পাঞ্জাবী ছেলেটির সঙ্গে ডিনারে কিছুটা সময় কাটাতে আপত্তি করার মত গোঁড়া ছিল না পর্ণা। দেখাই যাক না কি বলে ও। আর কিছু না হোক সময়টা তো ভাল কাটবে নিশ্চই। গিয়েছিল বেশ নামী দামী একটা হোটেলের ডাইনিং এ।

সুরিন্দর কাজের ছেলে। বেশী না ফেনিয়ে সোজাসুজি বলেছিল, নিউটাউনে ওর একটা বাইশশ' স্কোয়্যারফিটের

ফ্ল্যাট আছে ফোর্থ ফ্লোরে। পর্ণা ইচ্ছে করলে ভাড়া নিতে পারে। ওখানেই খুলতে পারে যে কোন বিজনেস লাইক কফিশপ, সাইবার ক্যাফে বা বুটিক। থাকতেও পারে। আইডিয়াটা বুকে নিয়ে হাওয়ায় ভেসে বাড়ী ফিরেছিল ও। সারারাত চিন্তার পর পারমুটেশান কম্বিনেশানের খেলায় শেষ অবধি বুটিকই জিতল।

পরদিন মা চায়ের টেবিলে বলেছিল, ‘‘এই ছেলেটি কেমন? বাড়ীতে আনবি নাকি একদিন? তোর বাবাকেও তো দেখানো দরকার।’’ মা স্বাভাবিকভাবেই ভেবে নিয়েছিল পর্ণার অ্যাফেয়ার এটা।

‘‘মা, ওকে বাড়ি আনার, তোমাদের দেখানোর মত সম্পর্কটা নয়। ইন ফ্যাক্ট ও ম্যারেড কিনা আমি তাও জানিনা।’’

‘‘তাহলে? কাল যে ডিনারে গেলি?’’

‘‘মা, ডিনারে আজকাল সবাই যায়। আমি একটা বুটিক খুলবো। ওর নিউটাউনের ফ্ল্যাট নেব রেন্টে। ওখানেই থাকব। তোমার আপত্তি নেই তো?’’

‘‘তোর বাবা রাজী হবেনা। তাছাড়া একা থাকার দরকার কি? নিজের মনের মত কাউকে এবার নাহয়...’’

‘‘মা, সুরিন্দর আমার বন্ধু। আমার ল্যান্ডলর্ড। আমাকে বড় হতে দাও এবার। একবার তো শুনেছি তোমাদের কথা।’’

মা কি একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল ওর কথা শুনে? নাকি দুঃখিত হল আশাভঙ্গ হওয়ায়? পর্ণা বোঝেনি।

‘‘ভাড়া কত ফ্ল্যাটের?’’

‘‘এই রে! ভাড়ার অ্যামাউন্টটা তো জেনে নেওয়া হয়নি! আচ্ছা দাঁড়াও জেনে বলছি।’’ টেবিলে বসেই ফোন করেছিল সুরিন্দরকে। জিজ্ঞেস করেছিল ভাড়া কত দিতে হবে। ওপারে সুরিন্দরের সেই দরাজ হাসি।

‘‘আরে বাবা, সে তুমি যা পারবে দিও। আমারই তো ফ্ল্যাট, অউর ম্যায় কোই গয়ের তো নেহী। শুধু মাঝে মাঝে আমাকে এক দো দিন স্টে করতে দিও। ওদিকে কাজ পড়লে দরকার হতে পারে...’’

ছেলেটা কি অনায়াসে আপনি থেকে তুমিতে চলে এল। পর্ণার একটুও কানে লাগেনি। এরকম হয় আজকাল। ও নিজেও তুমি করেই বলবে নাহয়। বয়স তো প্রায় সমান মনে হয়। আর এক দুই দিন যদি ও থাকতে আসে সেই দিনগুলো নাহয় পর্ণা মায়ের কাছে এসে থাকবে। ওর স্বপ্নের বুটিক একলাফে অনেকটা পথ পেরিয়ে ঘরের কাছে এসে পড়েছিল।

তারপর! তারপর কি যেন! পর্ণা এলোমেলো পায়ে পুরো বুটিকটা ঘুরতে ঘুরতে ভাবে। ভাবে কিন্তু সঠিক ছন্দে সাজাতে পারেনা ভেসে যাওয়া ঘটনার টুকরোগুলোকে। গেটের কাছে কতগুলো লোক জড়ো হয়ে আছে। কিছু পরেই ঢুকতে চাইবে ভেতরে। বার বার মনে পরে যাওয়া এই অবাঞ্ছিত শব্দগুলো এসে ভেঙ্গে দিতে চাইছে ওর স্মৃতিচারণ।

বাবা যথারীতি ভয়ঙ্কর বিরোধিতা করেছিল। তার মতে এসব কোন মেয়ের কাজ নয়। ওদের ফ্যামিলিতে কেউ কোনদিন ব্যবসা করেনি। ব্যবসা নাকি রক্তে থাকতে হয়। পর্ণার বলতে ইচ্ছে করেছিল ওদের ফ্যামিলীতে কেউ তো কোনদিন ডিভোর্সও করেনি। বলেনি। দাঁতে ঠোঁট কেটে দাঁড়িয়ে শুধু নিজেকে বলেছিল ভাঙ্গবনা কিছুতেই। যতই বাধা আসুক পেরিয়ে যাব সবটা। নিজের সমস্ত গয়না জমানো টাকা বেরিয়ে গেল হুড় হুড় করে। মা তার পৈতৃক ফ্ল্যাট বিক্রীর কয়েক লাখ টাকা বাবাকে না জানিয়ে ফিক্সড ভেঙ্গে দিয়েছিল। কত ঝড়। কত ধুলোর ঝাপটা। সব সহ্য করে করে সমস্ত বাধা সরিয়ে এই ফ্ল্যাটের ইন্টেরিয়র করেছে পর্ণা, সাজিয়ে তুলেছে মনের মত করে, ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত জায়গার শাড়ীতে ঝলমলে করে তুলেছে এর প্রতিটি কোন। নিজস্ব ওয়েবসাইট খুলেছে, ছোট লিফটটা লীজ নিয়েছে আরেকজন ফ্ল্যাট ওনারের কাছে। এটা শুধুমাত্র বুটিকেরই লিফট যা কিনা একধাক্কায় ওর বুটিকের স্ট্যাটাস বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকটা। এই বুদ্ধিটাও সুরিন্দরের। সে সারাক্ষণ পাশে থেকেছে তার ব্যবসাভর্তি মগজ নিয়ে। কখন যে সেই পাশে থাকাটা বন্ধুত্বের সীমা ছাড়িয়ে এসেছে এই পাঁচ বছরে!

বুটিকের নাম রাখতে গিয়ে মায়ের মুখটাই ভেসে উঠেছে বারবার। ওই মহিলা না থাকলে যতই জেদ থাকুক পর্ণা পারত না। তাই মাধুরী বুটিক। মা এসেছিল উদ্বোধনের দিন। আর এসেই পর্ণাকে কানে কানে বলেছিল, ‘‘নিচে কে দাঁড়িয়ে আছে দেখ গিয়ে।’’ ছুটে গিয়ে পর্ণা বাবাকে দেখেছিল গাড়ীর পাশে।

মেয়েকে আর ফেরায়নি বাবা। বোধহয় মেয়ে কি কাজটা করল এটা দেখার কৌতূহল তারও ছিল পুরোমাত্রায়। লিফটে ঢুকে চারদিকে মাধুরী বুটিক, ফুলে ভরা মাধুরী বুটিক দেখতে দেখতে বাবার মুখের পেশীগুলো

কেমন নরম হয়ে এসেছিল। যাওয়ার সময় ওর মাথায় হাত রেখে শুধু বলেছিল, ''হেরে যেওনা।''

আরো একটা কথা বলেছিল বাবা।

''সাজসজ্জায় এত খরচ করলে, এটা তো ভাড়া নিয়েছো ...''

''এটা সুরিন্দরের নিজের ফ্ল্যাট বাবা, কোন সমস্যা নেই...'' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেই চুপ করে গিয়েছিল পর্ণা। সুরিন্দরের সঙ্গে সম্পর্কটায় ওর নিজেরও অজান্তে তৈরি হতে থাকা কিছু ভিন্ন মাত্রা ধরা পড়েই গিয়েছিল গলার আওয়াজে।

অথচ আজও অবধি সেই মাত্রাটা এক জায়গায় রয়ে গেল। না একটু পেছোলো না একটু এগোল। পর্ণা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ভাবে। সত্যিই সুরিন্দর কোনদিনও মাত্রা ছাড়ায় নি। ওদের সম্পর্কটা শরীর পর্যন্ত গড়িয়ে এলেও ব্যবহারটা এমন রেখেছে যেন এটা খুব সাধারন একটা ব্যাপার। প্রথমদিকে বিছানায় ঘনিষ্ঠ হয়ে ছবি তোলাটা ওর নেশার মত ছিল। পর্ণা লজ্জা পেলে ও হাসত, তবু নানা ভঙ্গীর ঘনিষ্ঠতার ছবি তুলেই যেত। নিজেকে বলত সেলফি স্পেশ্যালিষ্ট। তারপর বহুদিন ছেড়েছে সেই শখ। প্রতি সপ্তাহে দু' তিন দিন আসে, থেকে যায় রাত্রে। কতবার পর্ণা ভেবেছে ওর বাড়ীতে কে কে আছে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু এত হালকা তুলোর মত সময়টা কেটে যায় ও এলে, হাসি গান গল্প আদরে আর কোন বাস্তব ঘেঁষা কথা হয়নি এত দিনেও। নিজেকে বুঝিয়ে নিয়েছে পর্ণা, এত সহজ ভাবে যখন ভালবাসতে পারে সুরিন্দর তখন জীবনে জীবন যোগ করার মূল কাজটা হয়েই গিয়েছে। মনে মনে প্রস্তুতি ছিল এবার যেকোন দিন ও বিয়ের প্রস্তাব দেবে। আসেনি সেই প্রস্তাব। অথচ সারাক্ষন পাশে থাকা, সমস্ত ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া, কিছুতেই ভাড়া নিতে না চাওয়া এইসবগুলো থেকে যে কেউ ধরেই নেবে যে ওদের মধ্যে রয়েছে একটা অন্য রসায়ন। পর্ণা নিজেও তো কতদিন ভেবেছে। ভেবেছে সুরিন্দর ওকে নিজের করে নিতে চাইলে আপত্তি জানাবে না। কারন সুরিন্দরকে ও নিজেও তো চিরদিনের জন্যই চায়। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছে কবে ও নিজের সব বাধা কাটিয়ে ওদের সম্পর্কটাকে একটা চিরস্থায়ী রূপ দিতে চাইবে। কিন্তু এই পাঁচ বছরে সুরিন্দর কোনদিন বলেনি সেকথা।

আমি কি কিছুই জেনেছি ওর আসল সব কথা? তাহলে কি অনেক আগেই এই খেলাঘরটা অন্য কোথাও শিফট করে নিতাম না? পর্ণা ভাবে। কত আর দেওয়াল দেখবে ও? সেই দেওয়াল যেটা আর ওর থাকবেনা, এখুনি অন্যের হয়ে যাবে, সেই দেওয়ালটা দেখতে দেখতে নিজের মনের ভেতরটাও দেখে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেখানে সব আঁকিবুকি ঝাপসা। মধুবনী প্রিন্টের মত সুন্দর ছবি আর ফোটেনা সেখানে।

গত পরশু নোটিস এল। রামজয় ফাইনান্স লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজার বিমল ঘোষ জানিয়েছেন আগামী পরশুদিন বেলা বারোটায় তার কোম্পানি এই ফ্ল্যাটের দখল নেবে। পর্ণাকে বুটিক সরিয়ে নিয়ে ফ্ল্যাট খালি করে দিতে হবে। মাথায় আচমকা হাতুড়ির বাড়ি অথবা বিনা মেঘে বজ্রপাত ইত্যাদি সব পরিচিত শব্দবন্ধের চেয়েও বেশী ছিল এই নোটিসের অভিঘাত। পর্ণা পাগলের মত ফোন করেছিল সুরিন্দরকে। তিন চারবার বেজে যাওয়ার পর ধরল। এক প্রায় অপরিচিত নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠের সুরিন্দর কাপুর জানিয়েছিল সে ব্যস্ত আছে, এখন কথা বলা সম্ভব নয়।

''সুরিন্দর! আমি পর্ণা...পর্ণা...''

''আরে ম্যয় কব বোলা কে তুম পর্ণা নেহী হো...''

''তুমি এখুনি একবার এসো..., আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা এই নোটিসটার ...এটা তো তোমার ফ্ল্যাট, আমি তোমাকে ভাড়া দিই মাসে মাসে ...। এই কোম্পানি কেন দখল নেবে?''

পর্ণার একের পর এক প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিতে অনিচ্ছুক ছিল সুরিন্দর। দায়সারা ভাবে বলেছিল, ''ইস মে কুছ বাত হ্যায়, তুম সমঝোগী নেহী...''

''মানে? আমি বুঝব না মানে? তো বোঝাও আমাকে, এখুনি বোঝাও ... লাখ লাখ টাকা আমি ঢেলেছি এই বুটিকের পেছনে...আমার জীবন দিয়েছি এখানে...'' উত্তেজিত পর্ণাকে শান্ত করতে সুরিন্দর বলেছিল, ''ওকে ওকে, আসছি আমি...''।

কিন্তু সে আসেনি।

সেদিন না। তারপরের দিন না। আজ তো আসার প্রশ্নই নেই। পর্ণা জানে আর আসবেনা সুরিন্দর। তাই অনন্তকাকু বা অনিমা বললেও আর ফোন করেনা ও। এখন ও পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট করে জানে। তাই ফোন করার আর প্রশ্নই নেই।

ওই নোটিসে একটা ফোন নম্বর দেওয়া ছিল। ওই

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে পর্ণা ছুটে গিয়েছিল ওনার চেম্বারে।

ভদ্রলোক ওকে প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল ওর সব প্রশ্নের উত্তর। সুরিন্দার কাপুর এই কোম্পানীর কাছে বারো কোটি টাকা ধার হিসেবে নিয়েছিল, সেই ধারের জন্য কোম্পানীর কাছে সে মর্টগেজ রেখেছিল কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গায় তার সাতখানা ফ্ল্যাট। তার মধ্যেই একটিতে পর্ণার বুটিক। বারো কোটি টাকা সুদে আসলে ষোলো কোটিতে দাঁড়িয়েছে। ডেট রিকভারি ট্রাইবুন্যালে তিনবছর ধরে মামলা চলার পর কোম্পানি অর্ডার পেয়েছে সমস্ত মর্টগেজড সম্পত্তি দখল নেওয়ার। সারফেসী অ্যাক্টের এই মামলায় ভাড়াটে হিসেবে পর্ণার কোন কিছুই বলার জায়গা নেই। আইন সেই সুযোগ রাখেনি।

পর্ণা স্থির হয়ে গিয়েছিল সবটা শুনে। ওর সামনে একটা ছাই রঙ আকাশ অজস্র কালো প্যাচ ওয়ার্ক নিয়ে যেন দুলে দুলে উঠছে। শাড়ির শরীরে এই কম্বিনেশন যতটাই সুন্দর, অকস্মাৎ জীবনে নেমে এলে ততটাই ভয়ংকর। বিমল ঘোষ বুঝতে পেরেছিলেন ওর মনের অবস্থাটা। আস্তে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

''কতদিন আপনি ভাড়া নিয়েছেন?''

''এই জুলাই এলে পাঁচবছর হবে।''

''তার অনেক আগে থেকেই প্রপার্টিটা মর্টগেজড। ওর আপনাকে জানানো উচিত ছিল।''

''আমাকে বারবার এটাই বলেছে এটা ওর ফ্ল্যাট, ভাড়াও নিতে চায়নি, আমিই জোর করে দিতে শুরু করেছি।''

''ওটা একটা মুখোশ। ভাড়ার কথাই তো প্রথমে বলেছিল বললেন ...''

''হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক...। আর ওই মামলাটা? ওটা...''

''ওটাও আপনাকে জানানো হয়নি তিনবছর ধরে..., হি ইজ সাচ আ ডেভিল...,'' পরিষ্কার বলেছিল ওই বিমল ঘোষ।

পর্ণা উঠে দাঁড়ায়, ''আমি তো টেনান্ট। আমার কোনই রিলিফ নেই? প্লীজ আমাকে একটা অ্যাডভাইস দিন। আমার এতদিনের পরিশ্রম, এত লক্ষ লক্ষ টাকা, আমার গুডউইল সব জলে চলে যাবে? আমার কি দোষ?''

ভদ্রলোক গম্ভীরমুখ আরো বেশি গম্ভীর করে তোলেন, ''সরী, আমি কোম্পানীর লোক। আপনাকে কোন অ্যাডভাইস আমার দেওয়ার কথাই নয়। বাট...''

''বাট?'' পর্ণার চোখে তখনো আশা ছিল।

''বাট আই রিয়েলী ফীল পিটী ফর ইউ। আগেই বললাম সারফেসী অ্যাক্টে টেনান্টের জন্য কোনই রিলিফ নেই। তবুও আপনি ট্রাইবুনালের কাছে সবটা বলে একটা স্টে অর্ডার চাইতে পারেন। চান্স খুব কম। তবু...ওনারা যদি মনে করেন...ইউ হ্যাভ টু জাস্ট নক দ্য ডোর অফ ইয়োর ফেট...।''

পর্ণা আর একটা মূহূর্ত সময় নষ্ট করেনি। গত পাঁচবছরে সমস্ত আপদে বিপদে ওর পাশে ছিল সুরিন্দর। আর আজ সেই সুরিন্দর ওকে প্রবল ঝড়ের মুখে ফেলে দিয়ে সরে আছে দূরে। এই বিপদে পাশে দাঁড়াবে এমন কোন মুখ মনে পড়েনা ওর। তার বদলে অনেকগুলো বছর আগে পরিচয় হওয়া সেই উকিলবাবুকে মনে পড়ে যায় যিনি ওর ডিভোর্স করিয়েছিলেন। সেই তমালবাবুর কাছে ছুটে গিয়েছিল কাল। তাকে বেশি বলতে হয়নি। নিচের কোর্ট ওপরের কোর্ট সর্বত্রগামী ব্যস্ত উকিল তমাল মজুমদার। তিনি ঘটনার গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গে জান প্রান দিয়ে চেষ্টা করবেন বলে কথাও দিয়েছেন।

আজ সেই স্টে হিয়ারীং। সুন্দর পাখি ডাকা দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকায় পর্ণা। সাড়ে এগারোটা বাজল। এতক্ষনে হীয়ারীং হয়ে যাওয়ার কথা। তমালবাবু বলেছেন আদালত মনে করলে জরুরি ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গেই অর্ডার দিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি হোয়াটস অ্যাপে সেই অর্ডার পাঠিয়ে দেবেন কোম্পানির লোকজনকে এবং পর্ণাকেও। আর আধঘন্টা সময় হাতে। অনন্তকাকুদের কারুর কাছে পরিষ্কার নয় কি হতে চলেছে। এটুকুই বুঝতে পারছে কিছু একটা ঝড় আসছে। কিন্তু সেই ঝড়ের স্বরূপ জানেনা তারা।

পর্ণা জানে। পর্ণা জানে ঝড় এলে আকাশে জমে থাকা মেঘ উড়ে যায়। সে তাই মনের সমস্ত মেঘকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য শক্তি জড়ো করতে চাইছে। কোম্পানি এই ফ্ল্যাট দখল নিয়ে নীলামে তুলবে সে শুনে নিয়েছে বিমলবাবুর কাছে। সেই নীলাম থেকে যে কেউ কিনে নিতে পারে ফ্ল্যাট। সেই টাকাটা এবার যোগাড় করতে হবে। সুরিন্দর ওকে এতদিন নিজের মত ব্যবহার করেছে। এবার ও সুরিন্দরকে একটুখানি ব্যবহার করবে, সেটা নিশ্চই অন্যায় হবেনা! নিজের স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য

এইটুকু তো করতেই হত। শুধু স্টে পেতে হবে আজ। মা কালীর ছবির সামনে একাগ্র প্রার্থনায় দাঁড়ায় পর্ণা। স্টে পেলে ওকে বুটিকটা শিফট করতে হবেনা। বাবার বাড়িতে হেরে গিয়ে ফিরতে হবেনা।

বাইরে ওরা অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করছে। এবার উঠতেই হবে। পর্ণা নিজের পার্সোনাল ড্রয়্যার থেকে বের করে খাম। অতিযত্নে অতি গোপনে রেখে দেওয়া সুরিন্দরের তোলা ছবিগুলোর প্রিন্ট আউটে চোখ বুলিয়ে নেয়। এগুলো ওকে না জানিয়েই প্রিন্ট করেছিল সুরিন্দর। ও ভীষণ রেগে যাওয়ায় সেই খোলা হাওয়ার মত হাসিটা দিয়ে ওকে আবার ভুলিয়ে দিয়েছিল।

এতদিনে ও জেনেছে সুরিন্দর কাপুর ম্যারেড, তার ঘরে রয়েছে অত্যন্ত গোঁড়া বাবা মা আত্মীয়স্বজন। ঈশ্বর জানেন এই ছবিগুলোকে কোনদিন ও ব্যবহার করতে চায়নি, দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি সেকথা। কিন্তু ঝড় এলে তাতে উড়ে যায় দ্বিধা দ্বন্দ ভালো মন্দের যত ধুলো। পড়ে থাকে শুধু রাজপথ। যে জিতবে সে হাঁটবে। দরকার হলে ব্যবহার করবে সে সবকিছু। পর্ণা হারতে চায়নি কখনো।

মহড়ার কাঁটা

দেবযানী বসু কুমার

আমি আর আমার কত্তা সখে শ্রুতি নাটক করি মাঝেসাঝে। মুখের ওপর তো কেউ খারাপ বলতে পারেনা তাই বলে থাকে বেশ ভালো হয়েছে আর সেই শুনে আমরাও গদ গদ হয়ে যাই। যদিও জানি ভালো এমন কিছু হয়না। তাও করি কারণ এত্ত স্ট্রেসফুল জীবনে এটা যেনো এক ঝলক দখিনা বাতাস। আর ভালো না হবার কারণ আমরা এই বুড়ো বয়সে এসে এসব পাগলামো শুরু করেছি। তবে শুরুটা করেছিলাম নিজেদের ভালো লাগে বলে। পরে বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক পেতে এখন এক বুক সাহস নিয়ে মঞ্চেও করে থাকি মাঝেমধ্যে। যদিও বুঝি দুর্বার সাহস আমাদের। দ্বিতীয়ত আমরা কারো কাছে শিখিনি। যে শেখাটা খুব দরকার। তার জন্য যে সময়টা দরকার সেটা নেই। তাই আমরা শুদ্ধাশুদ্ধি প্রণালীর মাধ্যমে এগিয়ে চলি এক পা এক পা করে। এই বয়সে যেটা প্রায় অসম্ভব। তৃতীয়ত আমাদের রিহার্সাল দেবার কোনো সময় নেই বলা যেতে পারে।

সবাই ভাবতে পারেন এত সময়ের অভাব কেনো? তার কৈফিয়ত দিচ্ছি—আমার কত্তাটি এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বাকি টা আর লিখলাম না। এই একটি বাক্যেই বাকিটা সবাই বুঝে যাবেন। আর আমাকেও সারাদিন রোজগারের ধান্দায় ঘুরতে হয়। এছাড়া এক আহ্লাদি আদুরে কন্যা আছে। তার ফাই ফরমাশ খাটতে হয়। এছাড়াও নানাবিধ অকাজ অকাজ আর অকাজ নিয়ে আমি সদা ব্যস্ত। এক এক সময় মনে হয় দিনটা যদি ছত্রিশ বা আটচল্লিশ ঘণ্টার হতো তাহলে মন্দ হতো না।

যেদিন সময় পাই, আমাদের রিহার্সাল দেবার সময় রাত বারোটা। সব কাজ শেষ করে, নৈশ আহারের পর বিছানায় উঠে প্র্যাক্টিস করে স্ক্রিপ্টটা মাথার পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়ি। পরদিন সকাল থেকে আবার ছোটা শুরু।

আমাদের খুব একটা ঝগড়া হয়না। অল্প বয়সে যদিও বা হতো এখন হয় না বললেই চলে। তবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই তার মানে আমাদের খুব মাখো-মাখো সম্পর্ক। না আমাদের ঝগড়া করার সময় নেই। সত্যি নেই। মতের অমিল তো আকছার হয় তখন আমরা নিরবতা পালন করি। দুজনেই গম্ভীর হয়ে যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত রাখি নিজেদের। তাই আমাদের মেয়ে আমাদের কখনো ঝগড়া হতে দেখেনি বললেই চলে।

যেদিনের কথা লিখছি, পরের দিন একটা মঞ্চ উপস্থাপনা আছে। তাই আমরা দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছি স্ক্রিপ্টের ওপর। সব সময় ঠান্ডা মেশিন চালাতে ভালো লাগেনা। তাই বারান্দার দরজা জানালা খুলে রেখেছি। সে রাতে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যায়নি। শুটিং শেষ করে এখানেই থেকে গিয়েছিল। আমরা প্র্যাক্টিস শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েছি। পরদিন সকালে উঠে আমার মেয়ের প্রথম কথা—কাল থেকে রিহার্সাল দিও দরজা জানলা বন্ধ করে তোমরা। সারা পড়ার লোক ভাবছে তোমরা চিৎকার করে ঝগড়া করছো। পুরো পাড়া নিস্তব্ধ। তোমাদের চিৎকারে সবার ঘুমের দফাগয়া। পাড়ার লোকজন ভাবছিল পুলিশে খবর দেবে। সবাই ভেবেছে তোমরা উদোম ঝগড়া করছো। এমন ঝগড়া যে একটা-আধটা খুন হয়ে যেতে পরে। আর আমার মেয়ে নাকি হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আমাদের চিৎকারে। ব্যাপারটা বুঝতে ওর সময় লাগে। তারপর ওর মনে হয় আমার মা বাবার তো কখনো ঝগড়া হয়না। হঠাৎ কি এমন হলো। তখন ও পাশের ঘর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসে আমাদের ঘরের দরজায় কান পাতে। শোনে কি সব অন্য নাম নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে। তখন বোঝে নাটকের মহড়া চলেছে। আবার গিয়ে শুয়ে পরে। আরো বলে পরের দিন নাকি ওর কাছে অনেক ফোন এসেছিল। সবার জিজ্ঞাস্য—হ্যাঁরে কি নিয়ে তোর বাবা মায়ের এত্ত ঝগড়া হচ্ছিল? আজ সব ঠিক আছে তো? (জানিনা এটা বানানো কিনা)।

মহড়া তো ফিস-ফিস করে হয়না। আমরা তো ভেবে ভেবে অস্থির তাহলে কখন মহড়া দেবো?

ছোটগল্প

কী করবে বিভু?

সঞ্জীবকুমার দে

কিছুটা দৌড়ে গেলে এখনও রিকশাটাকে ধরা যায়। অথবা চিৎকার করে ডেকে এখনও থামানো যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনটাই করতে পারছে না বিভু। হতচকিত হয়ে সে একবার দেখছে ক্রমশ দূরে চলে যাওয়া রিকশাটাকে, আর একবার তার বাঁহাতের মুঠোয় ধরা সদ্য কুড়িয়ে পাওয়া ভাঁজ করা পাঁচশো টাকার নোটটাকে। কী করবে সে?

পাঁচশো টাকা! এই মুহূর্তে বিভুর কাছে এক মহামূল্য সম্পদ।

এই দুর্মূল্যের বাজারে একটা পাঁচশো টাকা বিভুদের মতো পরিবারের অভাব কতটাই বা দূর করতে পারবে? এ সম্বন্ধে বিভু সচেতন। বিশেষ করে তার ডানহাতের থলেতে যখন এখনই ধরা রয়েছে সদ্য দোকান থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকায় কেনা শুধু এক কেজি আলু, আড়াইশোগ্রাম পটল আর একশো গ্রাম করে মুসুর ডাল ও সরষের তেল। চাল ও আটা বাদে তাদের পাঁচজনের সংসারের জন্য বরাদ্দ আজ রবিবারের বাজার! বাজার— কথাটিতে অবশ্য তীব্র আপত্তি বিভুর। মাত্র তেরো বছর বয়সেই নিজের মতো করে ভাবতে শিখেছে সে। আর সেই ভাবনায় এটাকে সে বলে— দোকান। বাজার করা বলতে যা বলা হয়, অন্য পাঁচজনে যা করে— এটা তো তা নয়!

পেটে খাওয়ার প্রশ্নে পাঁচশো টাকা তার পরিবারে কোন সুরাহা করতে পারবে না, একথা ছোট হলেও বিভু বোঝে। কিন্তু এই টাকাটা অবশ্যই কিছুটা হলেও রক্ষা করতে পারে তার পরিবারের ও তার বাবার সম্মান। যা গত সন্ধ্যায় ভীষণ ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে পাড়ার পুজো কমিটির কতিপয় চাঁদা আদায়কারীর রূঢ় আচরণে।

বাবা জানেন না, বিভু জানে—এ পাড়ার দুর্গাপুজোর এবার রজতজয়ন্তী বর্ষ। মস্ত জাঁকজমক করে পুজো হবে। মস্ত আয়োজন। ছাপিয়ে যাবে এ তল্লাটের সমস্ত পুজোকে। কোন একটা সংস্থার শারদ সম্মান অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন এঁরা। ইতিমধ্যেই একদিন সন্ধ্যাবেলা টিভির একটি চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে তাঁদের সাক্ষাৎকার। সেখানে সবিস্তারে জানিয়েছেন তাঁরা তাঁদের এবারের পরিকল্পনা।

মাথার ওপর এতবড় যাঁদের দায়িত্ব, চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁরা যে নির্মম হতেই পারেন—বাবা এটা বোঝেননি। তিনি শুধু নিজের পরিবারের পাঁচজনকে নিয়েই চিন্তিত। তাই অবুঝের মত একটা পঞ্চাশ টাকার নোট হাতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দরজায়।

টাকাটা দেখেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন একজন—'পঞ্চাশ! এটা একটা দুর্গাপুজোর চাঁদা? তায় রজতজয়ন্তী বর্ষ! আপনার বিবেচনা নেই?'

বাবা কাঁচুমাচু মুখে বলার চেষ্টা করলেন—'আসলে দিন আঠারো হল আমার জুটমিলটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ঠিক—'

'এবারও!' বাবাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই চেঁচালেন আর একজন,—'চার বছর হল এ পাড়ায় এসেছেন। চারটে দুর্গাপুজোর আগে ওই একই কথা শোনালেন—মিল বন্ধ হয়ে গেছে! বাঃ!'

এরা জানেন না। বিভু জানে, শুধু বাবার মিল নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সত্তর শতাংশ চটকলই ঠিক পুজোর আগে আগে বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয় নানারকম সমস্যায়। আসলে এই শিল্পটাই তো এখন রুগ্ন!

তখন ক্লাস ফোরে পড়ত বিভু, মিলেরই স্কুলে। বোন সবেমাত্র হয়েছে। সেবারই প্রথম বন্ধ হয়ে পড়ে বাবার মিলটা। বন্ধ থাকে টানা দেড় বছর। নিদারুণ কষ্ট, অর্থাভাব। পি.এফ. বা গ্যাচুইটির টাকা পাওয়ার জন্য স্বেচ্ছাবসর নিতে হয়েছিল বাবাকে। ছেড়ে আসতে হয়েছিল মিলের কোয়ার্টার। তখন থেকেই তারা এ পাড়ায়।

মালিকানা বদলের পর যখন আবার মিল খোলে, অনেক তদ্বির করে আবার চাকরি জুটিয়েছিলেন বাবা। তবে চুক্তির চাকরি। সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা, ভাতা, ইত্যাদি ছাড়া। মাসিক পাঁচ হাজার টাকা মাইনের কড়ারে। সেই থেকে এ ভাবেই চলছে। বছরে বার দুই বন্ধ হয়ে যায় মিল। হবেই। বাবা সেসময় কাজ খুঁজতে বেরোন। পান না

কোথাও। কায়িক পরিশ্রমের কর্মীরা যদিও বা এই মিলে, সেই মিলে ঘুরে দু'চার দিনের টুকিটাকি কাজ জুটিয়ে নিতে পারেন— কেরানীর কাজে বাবার সে সুযোগ নেই। তবুও চেষ্টা করেন।

এভাবেই দিন কাটে বিভুদের।

বিভু এবার ক্লাস এইটে। বোন ওয়ানে ভর্তি হয়েছে এবছর। বিভু একজন প্রাইভেট টিউটরের বাড়িতে পড়তে যায়। প্রতিদিন। সব ক'টা সাবজেক্ট। মাইনে দিতে দেরি হলে রাগ করেন না তিনি। মাইনের টাকা জোগান মা। টাকাটা আসে বাড়ি বসে দু'টো দর্জির দোকান থেকে পাওয়া অর্ডারি শাড়ির ফলস্ আর পিকোর কাজের মজুরি থেকে। এই কাজে ঠাকুমাও সহায়তা করেন মাকে।

এই হল বিভুদের পারিবারিক চিত্র। এমন চিত্র অনেক পরিবারেরই। কেউ খবর রাখেন, কেউ রাখেন না। কেউ নিজেদের দুর্দশার কথা জানান, কেউ জানান না। বিভুরা শেষোক্ত দলে। কিন্তু বছরে ওই দু'চারদিন খবর জানতে চাইবার পরিবর্তে খবরদারি করতে আসা কয়েকজনের সম্মুখীন হয়ে বাবাকে বলতেই হয়। বলে ফেলেছেন এবারও। আর বলেই তো এই বিপত্তি।

প্রায় মারমুখী হয়ে উঠলেন অন্য একজন— 'আরও দু-দিন ঘুরে গেছি আপনার দরজায়। টিকিটির দেখা নেই। এটা কি আমাদের পিতৃদায়? কাজ যখন নেই, তখন কোথায় থাকেন মশাই? রোজই শুনি—বাড়ি নেই, বাড়ি নেই।'

'এদিক সেদিক যেতে হয় কাজের চেস্টায়।' বাবা আহত স্বরে জানান।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' সমাধান বাতলালেন প্রথমজন— 'এখনও পুজোর বেশ কয়েকদিন বাকি আছে, কাজের চেষ্টা করে যান। সময়মত পাঠিয়ে দেবেন।'

বাবা হাঁ করে চেয়ে থাকেন।

'তবে ওই পঞ্চাশ-একশোয় হবে না! নিদেনপক্ষে পাঁচশো-টা টাকা পাঠাবেন।'

বাবার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়েছিল ছিল বিভু। চলে যেতে যেতে বাবার উদ্দেশে করা একজনের সংলাপ কানে আসে তার—'পরিবার ছাড়া এরা কিচ্ছু বোঝে না! এসব মানুষের কোন সামাজিক দায়িত্ব আছে?

একটু আগেই যে ঘটনাটা ঘটে গেল রাস্তায়, বিভু জানে না, গতরাতের চাঁদা আদায় করতে আসা সমাজকর্মীরা এটাকে সামাজিক দায়িত্ব বলবেন কিনা!

বর্ষা শেষের বেহাল পথ। উলটো দিক থেকে দ্রুত ছুটে আসা একটা মোটরবাইককে পাশ দিতে গিয়ে একটা সাইকেল রিকশা গর্তে পড়ে কাত হয়ে গিয়ে ধাক্কা মারে সটান একটা ল্যাম্প-পোস্টে। হুমড়ি খেয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছিলেন রিকশার একমাত্র সওয়ার ভদ্রমহিলা। তাঁর চশমা, হাতের পার্স, মোবাইল ফোন ছিটকে পড়েছিল এধার ওধার। একেবারেই বিভুর সামনে।

বাবা সকাল সকাল বেরিয়ে যাওয়ায় বিভুকে যেতে হয়েছিল দোকানে। দোকানের কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরছিল সে। ঘটনার আকস্মিকতায় একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিভু। মুহূর্তে ঠিক করে নিয়েছিল তার কী করা উচিত।

রিকশার কাত হয়ে পড়া দিকটা ঠেলে ধরে রেখে চালককে সে নির্দেশ দেয়। তার কথামতো চালক, আসন থেকে নেমে এসে অন্য পাশ থেকে টেনে রিকশাটাকে সোজা করে দাঁড় করায়।

ভদ্রমহিলা প্রায় বিভুর মায়েরই বয়সী। চোট বা আঘাত তাঁর খুব একটা লাগেনি। লাগত, যদি রিকশা একেবারে মাটিতে পড়ে যেত। কিন্তু পড়তে দেয়নি বিভু। তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বড় দুর্ঘটনা ঘটতে দেয়নি। রক্ষা পেয়েছেন তিনি।

রক্ষা পেয়েছেন ঠিকই, তবে খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন ভদ্রমহিলা। একটু লজ্জিতও। তড়িঘড়ি বিভু রাস্তা থেকে কুড়িয়ে দেয় তাঁর চশমা, মোবাইল, পার্স। সঙ্গে ভাঁজ করা কিছু টাকা, কয়েকটা কয়েনও।

যা স্বাভাবিক, ইতিমধ্যে তাই ঘটতে থাকল। একজন, দু'জন করে পথচলতি মানুষ জমা হতে হতে ছোটখাটো একটা জটলা তৈরি হয়ে গেল। কেউ পিঠটান দেওয়া মোটরবাইক আরোহীর দোষ খুঁজে পেল। কেউ রিকশা চালককে তিরস্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিভুর ভূমিকা কিন্তু তারিফ পেল না একটুও।

জটলা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য রিকশা চালককে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন ভদ্রমহিলা। যাওয়ার সময় একটা হাত একটু তুলে ধরে বিভুকে যেন ইঙ্গিতে বলে গেলেন—যাই।

অদ্ভুত প্রসন্নতায় বুক ভরে গেল বিভুর। মিনিটখানেক চুপটি করে দাঁড়িয়ে গেল সে। রিকশাটার এগিয়ে চলা পথের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর

দু'তিন পা বাড়াতে না বাড়াতেই এই বিপত্তি! ল্যাম্পপোস্ট পেরিয়ে রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষে পড়ে ভাঁজ করা এই নোটটি। নীচু হয়ে তুলে নিয়ে দেখে পাঁচশো টাকা! নিশ্চিত ওই ভদ্রমহিলার। যা তাঁর তো বটেই, সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

বিভু হতচকিত। কী করবে এখন? কী করা উচিত তার? দৌড়ে গিয়ে ধরবে রিকশাটাকে? ফিরিয়ে দিয়ে আসবে—এই পড়ে পাওয়া পাঁচশো টাকা, জন্মসূত্রে পাওয়া তার সততাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে? নাকি তুলে দেবে গতরাতের চাঁদা আদায়কারী সেই স্বঘোষিত সমাজসেবীদের ভাণ্ডারে—তাদের পারিবারিক লাঞ্ছনা আটকাতে?

নিদারুণ অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে, রূঢ় বাস্তবকে নিয়ে চলতে চলতে, যে বিভুর মস্তিষ্ক তার বয়সের চেয়ে অনেক এগিয়ে, যে বিভু চকিতে সব বুঝে নেয়, যথোচিত সিদ্ধান্ত নেয়—সেই বিভুই বিভ্রান্ত এই মুহূর্তে।

বিভু কি সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা কেউ তা জানি না। শুধু এটুকু জানি, সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া এই ছোট্ট ছেলেটি যদি তার জীবনের প্রথম অসৎ কাজটি করে—তা কতিপয় ছদ্ম-লুঠেরার জন্যই, যারা প্রতিনিয়ত ছলে, ছুতোয় সমাজকে লুঠ করে চলেছে!

ছোটগল্প

বসুধা ও মা সুনয়না

বিতস্তা ঘোষাল

খানিক আগে দিনান্তের শেষ সূর্য আকাশ রাঙিয়ে অস্তমিত।ভোরের নরম ওম গায়ে মেখে যে পাখিরা আহার সংগ্রহের জন্য বেরিয়েছিল, তারা নীড়ে ফিরছে। ঘরে ফেরার সমবেত গান তাদের কণ্ঠে। মহীরুহের যে পাতাগুলো সূর্যের আলোয় ঝিক মিক করে সবুজ থেকে আরো সবুজ হয়ে উঠেছিল সেগুলো এখন রং বদলে কালো বলে বিভ্রম হচ্ছে।

এই সময়টা সীতা রোজ আশ্রমের উঠোনে বসে চোখের সামনে একটু একটু করে পালটে যাওয়া প্রকৃতির রূপ দেখে।ভাবে প্রত্যেকে দিনের শেষে নিজেদের এক নিশ্চিন্ত ঠিকানায় ফেরে।কিন্তু তার ঠিকানা কোথায়? কোথায় কার কাছে তার ফেরার কথা?কে তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে?

জন্ম মুহূর্ত থেকে যে মিথিলাকে সে তার জন্মভূমি বলে জেনেছে, যে মিথিলারাজ জনক ও রানি সুনয়নাকে বাবা-মা বলে ডেকেছে, জ্ঞান হবার পর শুনেছে আসলে সে তাঁদের পালিত সন্তান। শ্রাবণ মাসের হল উৎসবে মাটি কর্ষণের সময় লাঙলের ডগায় তাকে পেয়ে কুড়িয়ে এনেছেন তাঁরা। তাকে যতই মৈথেলী বলে ডাকা হোক না কেন মিথিলা তার পিতার ঠিকানা নয়। তার প্রকৃত পিতা-মাতা কারা, কোথায় তার আসল ঠিকানা কিছুই তার জানা নেই।

রঘুকূলপতি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে বিয়ের পর আর পাঁচটা মেয়ের মতোই সেও ভেবেছিল অযোধ্যাই তার বাকি জীবনের স্থায়ী ঠিকানা। কিন্তু মাতা কৈকেয়ীর ইচ্ছেয় দশরথের নির্দেশে চোদ্দ বছরের বনবাস পর্বে এক বন থেকে আরেক বন, এক কুটির থেকে আরেক কুটির, শেষপর্যন্ত লঙ্কায় অশোকবনে দু-বছর কাটাবার পর অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে অযোধ্যায় নিজ গৃহে প্রবেশ করলেও চার মাসের মধ্যেই মোহ ভঙ্গ হয়েছিল তার। রাম তাকে গৃহচ্যুত করে আবার অরণ্যে নির্বাসন দিয়েছিল।

এবার সে একা। সঙ্গে গর্ভস্থ দুই সন্তান। অপেক্ষা করছে ভূমিষ্ঠ হবার। বাল্মিকীর আশ্রম তার এখনকার ঠিকানা। কিন্তু সীতা আদৌ জানে না, এই আশ্রয় তার কতদিনের জন্য বরাদ্দ। কবে এখান থেকেও তাকে উচ্ছেদ করা হবে কিম্বা সে নিজেই বাধ্য হবে অন্য কোনো ভিটে খুঁজে নিতে সে প্রশ্নের উত্তরও তার কাছে এই মুহূর্তে নেই।

অবশ্য সে অরণ্য ভালোবাসে।মাটি ভালোবাসে। জন্ম থেকেই সে বুঝেছে মাটি অরণ্য পাহাড় নদী আকাশ নিয়ে যে বসুন্ধরার সংসার সেখানে সকল প্রাণীর সমান অধিকার।সেই অধিকার নিয়েই সে রয়েছে।

ছোটো বেলায় যখন মা সুনয়না তাদের নিয়ে পাহাড়ের কোলে জঙ্গলে শিকার করার তালিম দিতে নিয়ে যেত তখন পাটকাই পাহাড়ের বুকে নানান শ্রেণির গাছেদের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতো। কোন গাছের মূল শিকড় জলে সিদ্ধ করে কোন মহৌষধ হবে, কোন পাতা কিসের কাজে লাগবে, কোন জরিবুটি অস্ত্র প্রচারের পর রক্ত বন্ধ করে ক্ষততে প্রলেপ দিতে সাহায্য করবে, কোন গাছের পাতা বেটে মাথায় লাগালে চুল ঘন হবে, কিসে ঠোঁট হবে লাল...পুঙ্খানুপুঙ্খ শিখেছিল তারা।

শুধু কি তাই! পাতার মর্মর ধ্বনীতে কিসের শব্দ কোন বিপদ লুকিয়ে তারও তালিম পেয়েছিল তারা। সেই কারণেই বনবাসের দিনগুলো তার কাছে স্বর্গ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন! যেন প্রতিটি দিন তার কাছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর।

এখানে তার আসার খবর পাওয়া মাত্র মা এসেছিল তাকে নিতে। মিথিলাবাসী তার সঙ্গে হওয়া এই অন্যায় কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। জনক নন্দিনীর এই অপমান তাঁদেরও অপমান। জনক রাজ সারা দেশ থেকে আসা রাজপুত্রদের তাঁর নগরীতে থেকে শাস্ত্র পাঠের সুবিধা দিলেও অযোধ্যার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন খবর পাওয়া মাত্র।

মিথিলার পরবর্তী শাসক ঊর্মিলা, এমনকি সাংক্য রাজ্যের উত্তরসূরী মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিও অযোধ্যার সঙ্গে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি খারিজ করে দিয়েছিল।

মা সুনয়না সে কথা জানিয়ে তাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য বাল্মিকীর আশ্রমে এসেছিল।

—তোমার এখন যথাযথ আহার, বিশ্রাম, যত্ন দরকার বৈদেহী।এত দিন তুমি মিথিলায় যাওনি,আমরা তোমাকে বার বার নিয়ে যেতে চাইলেও তুমি রামের অজুহাত দেখিয়েছ।আমরা তা মেনে নিয়েছিলাম। কারণ রাম তোমার স্বামী। সে তোমার সঙ্গে ছিল। কিন্তু এখন তোমাকে আমি কোনোভাবেই এখানে থাকতে দিতে পারি না। সুনয়না বলেছিল।

সীতা একবার ভেবেওছিল মিথিলায় ফিরে যাবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মত পরিবর্তন করেছিল। তার মনে তখনও আশা ছিল রাম ঠিক আসবে তাকে নিতে। রঘুবংশের বর্তমান রাজার পুত্র এভাবে অনাহুতর মতো এক মুনির আশ্রমে হবে, তা সে নিশ্চয়ই মেনে নেবে না।

সে মাকে বুঝিয়েছিল—এখন ক-দিন এখানে থাকি। যখন প্রসবের সময় হয়ে আসবে, তুমি এসো। তখন আমি মিথিলায় যাব মা।

সুনয়না মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি বুঝেছিল কে জানে! তবে আশ্রম কন্যা তার প্রিয় তাপসী আত্রেয়ীকে দায়িত্ব দিয়ে গেছিল সীতার দেখাশোনার।

প্রসবের দিন যত এগিয়ে আসছিল সীতা তত শান্ত হয়ে যাচ্ছিল। সে ক্রমশ অনুভব করছিল রাম আসবে না তাকে নিতে। শুধু সন্তান জন্ম দেওয়াই নয়, তাদের বড়ো করে তুলতেও হবে তাকেই। এই যাত্রাটা তার একার। সে তাই নিজেকে আরও একাত্ম করে নিচ্ছিল প্রকৃতির সঙ্গে। তার মনে পড়ত কিভাবে মা তাকে শেখাত বীজ বপন করতে হয় জমিতে। একটা চারা থেকে আরেকটা চারা কিভাবে জন্ম নেয়। কৃষি বিদ্যার প্রাথমিক পাঠ মায়ের কাছে নিলেও বনবাসে থাকাকালীন ঋষি বিশ্বামিত্রর থেকে সে শিখেছিল ফলন বৃদ্ধির রসায়ন। মাটিতে কতটা সার মেশালে তা আরও উর্বর হয়ে উঠবে, সেই বিদ্যা অনুশীলন করেছিল সেই পর্বে।

তার পরামর্শে ও পরিচালনায় মুনির আশ্রমের সামনে এখন নানান সব্জির বাগান গড়ে উঠেছে। সীতা সেদিকে তাকিয়ে দেখে বীজ থেকে অঙ্কুরদ্গম হচ্ছে, চারাগুলো কিভাবে একটু একটু করে ডালপালা বিস্তার করছে। সেদিকে তাকিয়ে সে ভাবে এদেরও একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। মাটি মা তার কোলে এদের ঠাঁই দিয়েছেন। তাকেও নিশ্চয়ই ফেলে দেবেন না।

অবশেষে সীতা দুই সন্তানের জন্ম দিল। তাদের নাম রাখলেন বাল্মিকী। লব আর কুশ। এই লব-কুশের মুখ দিয়েই রাম গাথা পরিবেশন হবে। রামচন্দ্র নিজের পুত্রদের চিনে নেবেন। সীতা সম্মানে নিজের ঘরে ফেরত যাবেন। এই অবধি যা যা ঘটেছে সব কিছুই নিপুণ দক্ষতায় তিনি একটু একটু করে রচনা করেছেন। লঙ্কা কাণ্ড পর্যন্ত তিনি যা যা লিখেছেন তার বিশেষ হের ফের ঘটেনি। এখন তিনি উত্তরা খণ্ডের দিকে এগোচ্ছেন। যেখানে লব-কুশ তাঁর কাছে তালিম নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে গেলে তিনি এই এত বছর ধরে লেখা শ্লোকের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন।

কিন্তু এই কাণ্ডে এসে তার খাগের কলম বারবার আটকে যাচ্ছে। কেন কে জানে যে শ্লোক তিনি লিখতে চাইছেন তা হচ্ছে না কিছুতেই। যে সীতাকে তিনি এখানে রাতের অন্ধকারে আশ্রয় দিয়েছিলেন রাজ দুহিতা, রাজবধূ হিসাবে সে যে কখন তাঁর কন্যা হয়ে উঠেছে তা তিনি টেরও পাননি। তাঁর পূর্ব জীবনে সন্তান থাকলেও তার সঙ্গে এভাবে যোগ তৈরি হয়নি। কিন্তু সীতা যেন এসেছেই তার পিতৃ হৃদয়ের অতৃপ্ত আত্মাকে শান্তি দেবার জন্য। 'হে জনক আপনি ভাগ্যবান, সীতাকে লালন-পালন করার সুযোগ পেয়েছেন আপনি।' 'মহারানি সুনয়না আপনি সেই মহান নারী যিনি সীতা নিজের সন্তান না জেনেও আত্মজর মতোই তাকে বড়ো করেছেন। মাতৃ কূলের গর্ব আপনি। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নারীরা আপনাকে দেখে শিক্ষা নেবে নিজের গর্ভে ধারণ না করলেও যথার্থ মা হয়ে ওঠা যায়। আপনাকে আমার প্রণাম।'

বাল্মিকী নিজের মনেই এসব বলেন, লেখেন। সদা চোখে চোখে রাখেন তার আদরের স্নেহের সীতাকে।

সীতা যমজ সন্তান জন্ম দিয়েছেন, খবর পেয়েই আশ্রমে ছুটে এসেছেন সুনয়না। মাকে পেয়ে সীতাও খানিক শান্ত। সুনয়না চান এবার সীতা তাঁর সঙ্গে ফিরে চলুক মিথিলায়। কিন্তু বাল্মিকী তা চান না। সীতা মিথিলায় চলে গেলে এই কাহিনি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কে দেবে এই সুদীর্ঘ শ্লোকের স্বীকৃতি! অযোধ্যা আর রাম-তাদের কাছে পৌঁছাতেই হবে রামায়ণ নিয়ে। তবেই না তা ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে। তিনিই হবেন পৃথিবীর আদি লেখক। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি মা আর সন্তানের মধ্যে অন্তরায় হতে চান না। অপেক্ষা করেন সীতার কথা শোনার।

এক সন্ধেয় সুনয়না সীতার দীর্ঘ কালো চুল বাঁধতে বাঁধতে বলেন—মৈথেলী এবার আমার সঙ্গে তোমাকে

যেতেই হবে। পুরো মিথিলা রাজ্য অপেক্ষা করছে নবাগত দুই সন্তানকে দেখার জন্য।

সীতা কথাটা শুনেও চুপ রইল। সুনয়না আবার বলল—সীতা, আমার ধারণা আর দিন-দুয়েকের মধ্যেই তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। এতটা রাস্তা যেতে হবে আমাদের। তাই তোমার শারিরীক দুর্বলতা কেটে যাওয়া অবধি আমি এখানেই থাকব। তারপর তোমাদের নিয়ে মিথিলায় ফিরে যাব।

সীতা এবারও কোনো উত্তর দিল না। সুনয়না বলল—আমি ভাবতেই পারছি না তুমি মা হয়ে গেলে। আমার চোখে এখনও তোমাকে পাওয়ার প্রথম দিনটা ভেসে ওঠে। বসুন্ধরা যেন আমার জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন।

খুব ধীর স্বরে এতক্ষণে সীতা বলল—আমি আসলে কার সন্তান মা?

—কী বলতে চাইছ তুমি সীতা? তুমি আমার সন্তান। আমার স্নেহ ভালবাসা স্বপ্ন আদর শিক্ষা সবকিছু দিয়ে তিলতিল করে বড়ো করে তুলেছি তোমাকে। তুমি আমার প্রথম কন্যা।

—কিন্তু তোমার নাড়ি কেটে আমি ভূমিষ্ঠ হইনি। জনক রাজের ঔরস-জাত নাকি বাইরে থেকে আমাকে কেউ ফেলে গেছিল? আমি কার সন্তান? অবৈধ? নাকি মেয়ে হবার অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করেছিলেন আমার জন্মদাত্রীরা?

—কি বলছ এসব তুমি? এসব কথা এতদিন বাদে উঠছে কোথা থেকে? বিশ্ব সংসার জানে আমি তোমার মা। মিথিলা রাজ তোমার বাবা।

—আমি তোমাদের পালিত সন্তান। সারা বিশ্ব এটাও জানে। হয়তো সেইজন্যই রামচন্দ্র এত সহজে আমাকে ত্যাগ করতে পারলেন। তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, আমার হয়ে শক্ত ভাবে কেউ লড়াই করবে না। প্রতিবাদও আসবে না।

—এ তোমার ভুল ধারণা সীতা। মিথিলা অযোধ্যার সঙ্গে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। বাকি রইল অযোধ্যার বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা। কিন্তু তুমি ভালোভাবেই জানো জনক রাজ যুদ্ধ বিরোধী। তাছাড়া আমাদের আর তিন কন্যাও ওখানেই।

—ঠিক। তাদের ভাগ্যও ওই পরিবারের সঙ্গেই যুক্ত। তাদের আমার মতো পরিত্যগ করার মূর্খামি রাঘব বংশের কেউ করবেন না। সেদিক থেকে অবশ্য আমি খুশি। তারা ওখানে বন্দি, আমি মুক্ত। তারাও যন্ত্রণায় অপমানে বিদ্ধ। একটাই পার্থক্য আমার মতো ঠিকানাহীন নয়।

—এ তুমি কি বলছ সীতা? তুমি আমাদের বংশের প্রথম সন্তান। আমাদের মিথিলার ভাগ্যাকাশে তুমিই সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তোমার আগমনেই দীর্ঘদিনের খরা মৃত্যু অনাহার কাটিয়ে মিথিলা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রজাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছ তুমি।

—এ তোমাদের মহানুভবতা, আমাকে এমনভাবে স্বীকৃতি দিয়েছ। আমি যখন ছোটো ছিলাম, তখন একবার কেউ বলেছিল পালিত কন্যাকে নিয়ে এমন আদিখ্যেতা কেন বুঝি না। আমার মনে আছে, তুমি তাকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। পরে জেনেছিলাম, তুমি বলেছিলে এই কথা একবার শুরু হলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে, তখন প্রজারাও নানা কথা বলতে চাইবে। তাই তা গোড়াতেই ছেটে ফ্যালা ভালো। অথচ দেখো, রাম, আমার স্বামী প্রজাদের মুখে আমার চরিত্র নিয়ে আলোচনা শুনে এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন না তাড়িয়ে দিতে প্রাসাদ থেকে। আমি বাঁচলাম না মরে গেলাম, সেই খোঁজ টুকুও নিলেন না।

—বৈদেহী আমি বুঝতে পারছি তোমার মন অশান্ত। এই অপমান তুমি মেনে নিতে পারছ না। কিন্তু আমাদের কাছে তুমি কখনো বাইরের নও, আত্মজন। রক্তের না হলে কি মা হয়ে ওঠা যায় না? সুনয়নার কণ্ঠে অসহায় বিষন্নতা। মা হিসাবে কি আমি পরীক্ষায় ব্যর্থ তবে?

—মা, আমি জানি না আমার গর্ভধারিনী কেন আমাকে ফেলে গেছিলেন, তাঁর কোন অসহয়তা জড়িয়ে ছিল এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে, কিন্তু এটুকু নিশ্চিত তুমি যেভাবে যেভাবে সবদিক থেকে ভরিয়ে রেখেছিলে, তিনি তা পারতেন না। তুমি-ই আমার মা।

—তাহলে আজ কেন এই নিয়ে এত প্রশ্ন তুলছ সীতা?

—প্রশ্ন তুলছি না,উত্তর খুঁজছি। আমি কে তার থেকেও বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ। তাদের স্থান কোথায় হবে? রাজ বংশে জন্ম নিয়েও তাদের ভাগ্য কোন দিকে নিয়ন্ত্রিত হবে- তারা কি রামের সন্তান—এই পরিচয় পাবে নাকি চিরকাল জারজ সন্তান হিসাবে সমাজ চিনবে তাঁদের?

—এসব কেন ভাবছ তুমি? রাম মানুক না মানুক, অযোধ্যা তাদের রাজপুত্র হিসাবে বরণ না করলেও মিথিলার উপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে সীতা। ঊর্মিলার সন্তান আর তোমার সন্তানের মধ্যে সেখানে কোনো প্রভেদ থাকবে না।

—আমি জানি মা। তবে শেষ পর্যন্ত সময়ই বলবে কি ঘটবে তাদের ভাগ্যে। আপাততঃ আমি নিশ্চিন্ত তোমরা আছো আমাদের সঙ্গে।

—তোমাকে আমার সঙ্গে এবার যেতেই হবে সীতা। সুনয়না বলল।

সীতা মায়ের বুকে মাথা রেখে বলল—এত কাল খোলা আকাশের নিচে কাটানোর পর চার-দেওয়াল আর আমার ভালো লাগে না। আমার মুক্তি এখানেই। এই ঘাসে, এই আকাশে, এই মেঠো ধুলোয়। এই আশ্রমিকদের মধ্যে, বিশেষ করে পিতা বাল্মিকীর স্নেহে আমি নিজেকে অন্য ভাবে আবিষ্কার করেছি। চেনা বৃত্ত থেকে অচেনায়, নিজের আমিকে উর্ধ্বে রেখে আমি এখন অন্য আমির সন্ধান পেয়ে গেছি। এখানেই আমি ভালো আছি মা।

সুনয়না মেয়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই সীতা বসুন্ধরার, বসুধা সে। তাকে বেঁধে রাখার শক্তি কারোর নেই। ফিরে যাবার সময় সুনয়না মেয়েকে আদর করে ভূমির দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলল—হে, করুণাময়ী বসুন্ধরা, বসুধাকে যথাসময়ে নিরাপদ আশ্রয় দিও।

অষ্টাবক্র মুনির গল্প

সমুদ্র বসু

ভাবতে পারা যায় যে, একজন মুনি তাঁর মাতৃগর্ভে থাকার সময়ে নিজের পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন? তাও আবার যেমন তেমন অভিশাপ নয়। তাঁর পিতার অভিশাপ ছিল জন্মের সময় তাঁর আটটি অঙ্গই হবে বাঁকা এবং নাম হবে অষ্টাবক্র। আজ্ঞে হ্যাঁ পুরাকালে এমনই এক নির্মম ঘটনার মধ্য দিয়ে জন্মেছিলেন অষ্টাবক্র মুনি। তবে এখানেই এই ঘটনার শেষ নয়। এই মুনি নিজের মেধা, প্রজ্ঞা ও তপস্যার দ্বারা মুক্তিও পেয়েছিলেন সেই বিকলাঙ্গতার অভিশাপ থেকে। শুধু তাই নয়, তাঁর হাতেই রচিত হয়েছিল অষ্টাবক্র গীতা। এছাড়াও সূর্যবংশীয় রাজা ভগীরথকে নতুন জীবন দান করে তাকে নির্বংশ হওয়ার হাত থেকেও বাঁচিয়েছিলেন এই মুনি। পরবর্তীকালে সেই বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। আবার বক্রেশ্বর শিব ও সতীপীঠের সাথেও জড়িয়ে আছে এই মহাজ্ঞানী মুনির নাম।

পৌরাণিক যুগে শিক্ষার্থীদের গুরুগৃহে থেকে শিক্ষা গ্রহন করার একটা রীতি ছিল। তাই ছেলেবেলায় অরুণী, উপমণ্যু এবং বেদ নামের তিন শিষ্য তাদের গুরু অয়োদ ধৌম্য ঋষির আলয়ে বিদ্যাশিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। তখন বর্ষাকাল, একদিন জলের তোড়ে ঋষি ধৌম্যের জমির আল ভেঙে গিয়েছিল। তখন তিনি তাঁর শিষ্য অরুণীকে ডেকে আল বেঁধে আসার নির্দেশ দিলেন। গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্য অরুণী আল মেরামতের জন্য মাঠে পৌঁছালেন। কিন্তু জলের তীব্র বেগের কারনে তিনি কিছুতেই আল বাঁধতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। অন্যদিকে আল না বাঁধতে পারলে তা গুরুর আদেশ অমান্য করা হবে ভেবে তিনি নিজেই ভাঙা আলের স্থানে শুয়ে পড়ে জলের গতি রোধ করলেন। এদিকে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। ঋষি ধৌম্যের অন্য শিষ্যরা গুরুগৃহে ফিরে এলেও অরুণীর দেখা নেই। চিন্তিত ঋষি অপর দুই শিষ্য উপমন্যু ও বেদকে সঙ্গে নিয়ে আল ভাঙা জমি অভিমুখে রওনা হলেন। গুরু ডাকলেন ''বৎস অরুণী কোথায় আছ, ফিরে এস।'' কিছুক্ষণ পর অরুণী গুরুর সম্মুখে এসে করজোড়ে নিবেদন করল, ''ক্ষমা করবেন গুরুবর, জলের স্রোত এত বেশী ছিল যে আমি মাটি দিয়ে জলপ্রবাহ রোধ করতে পারিনি, আবার আপনার আদেশও অমান্য করতে পারিনি। তাই আমি নিজের শরীর দিয়ে জলপ্রবাহ রোধ করার চেষ্টা করছিলাম। এখন আপনার আদেশে উঠে এলাম। আজ্ঞা করুন গুরুদেব, এখন কি করতে হবে।'' নিজের শিষ্য অরুণীর এমন অতুলনীয় কর্মনিষ্ঠা ও গুরুভক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঋষি ধৌম্যের মুখমন্ডল। বললেন, ''হে অরুণী, তুমি কেদারখণ্ড বিদারণ করে উঠে এসেছ সেইজন্য তোমার নাম হবে উদ্দালক। আর আমার আজ্ঞা অতি শ্রদ্ধাভরে পালন করেছ সেজন্য তুমি শ্রেয়োলাভ করবে এবং সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমার অন্তরে প্রকাশিত থাকবে।'' কেদারখণ্ড অর্থাৎ জমির আল ভেদ করে ওঠার জন্য আরুণির নাম হয় উদ্দালক।

পরবর্তীকালে এই অরুণী তথা উদ্দালক হয়ে ওঠেন একজন মহাজ্ঞানী ও বেদজ্ঞ ঋষি। কালের পরিক্রমায় তাঁর আশ্রমও ভরে ওঠে শিষ্যদের আনাগোনায়। উদ্দালকের পুত্রের নাম ছিল শ্বেতকেতু এবং কন্যার নাম ছিল সুজাতা। তাঁর আশ্রমে কহোড় নামক একজন শিষ্য ছিলেন যাকে উদ্দালক খুবই ভালোবাসতেন। একসময়, সেই কহোড়ের হাতেই নিজ কন্যা সুজাতাকে সমর্পণ করলেন তিনি। কহোড় মুনি ও তাঁর স্ত্রী খুব সহজ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেন। প্রতিদিন প্রাতে কহোড় মুনি সুজাতাকে বেদ পাঠ করে শোনাতেন। মাতৃগর্ভ থেকে এই বেদপাঠ শ্রবণ ও শিক্ষা করতেন তাদের অনাগত সন্তান। এই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই বেদ শাস্ত্র এতটাই নির্ভুলভাবে আয়ত্ব করেছিলেন যে, একদিন সেই শিশু তাঁর পিতার ভুল ধরিয়ে দেন। ঘটনাটি হচ্ছে, একদিন কহোড় মুনি যথারীতি তাঁর স্ত্রী সুজাতাকে বেদ পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন। এমন সময় সুজাতার গর্ভ থেকেই তাঁদের সন্তান বলে উঠল, হে পিতা, আমি দীর্ঘদিন যাবৎ আপনার কণ্ঠে বেদ শ্রবণ করেছি এবং হৃদয়াঙ্গম করেছি। কিন্তু আজ আপনি অন্যমনস্ক হয়ে ভুল পাঠ করেছেন।

অনাগত সন্তানের এমন অপমানজনক বাক্য শুনে

রাগে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলেন মহামুনি কহোড়। বললেন— ‘‘কি স্পর্ধা! আমার সন্তান হয়ে আমার বেদপাঠের ভুল ধরছে! তাও মায়ের গর্ভে থেকেই!’’ মহামুনি কহোড়ের এই ক্রোধ জন্ম দিল অভিশাপের। তিনি বলে উঠলেন—‘‘এই পাপে তুই যখন জন্মাবি, তোর শরীরের আট জায়গা বাঁকা থাকবে—লোকে তোকে বলবে—‘অষ্টাবক্র’। যাইহোক, এর কিছুদিন পরের কথা। একদিন রাজর্ষি জনক ঘোষণা করলেন, যিনি তাঁর সভায় শাস্ত্রযুক্তিতে তাঁর সভাপণ্ডিত বন্দীকে পরাজিত করতে পারবেন, তাঁর আর কোন অভাব থাকবে না। ঘোষণাটি পৌছাল মহামুনি কহোড়ের কাছে। মুনির সংসারে তখন দারুন অভাব। তাই তিনি ভাবলেন রাজসভায় গিয়ে বন্দীকে পরাজিত করে কিছু ধন দৌলত নিয়ে আসবেন। কিন্তু কহোড় মুনির ভাগ্য ছিল এর বিপরীত। রাজপণ্ডিত বন্দীর কাছে তর্কযুদ্ধে দারুনভাবে পরাজিত হলেন তিনি। আর সেই তর্কযুদ্ধের শর্ত অনুযায়ী জলে ডুবিয়ে দেওয়া হল কহোড়কে।

এর কিছুদিন পরেই জন্ম নিলেন অষ্টাবক্র মুনি। জন্মের পর থেকেই তাঁর শরীরে ছিল আটটি বাঁক। যে কারনে অন্য স্বাভাবিক শিশুদের মত তিনি স্বাভাবিকভাবে চলাফেলা করতে পারতেন না। এদিকে সুজাতার পিতা তথা অষ্টাবক্রের মাতামহ উদ্দালকের নির্দেশ ছিল, অষ্টাবক্র যেন কোনওভাবেই তাঁর পিতার করুণ দশা না জানতে পারে। তাই ছেলেবেলা থেকেই অষ্টাবক্র তাঁর মাতামহ উদ্দালককে তাঁর পিতা ও মাতুল শ্বতকেতুকে তাঁর ভ্রাতা বলে জানতেন। এভাবেই দিন কাটতে থাকল অষ্টাবক্রের। দিনে দিনে বড় হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু কথায় বলে সত্য কখনো চাপা থাকে না, অষ্টাবক্রের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। তাঁর মাতা, মাতামহ ও মাতুলের অসংলগ্ন কথাবার্তার জেরে একসময় তিনি তাঁর মাতার মুখ থেকে বের করে আনলেন আসল সত্য। অর্থাৎ তিনি জানতে পারলেন তাঁর পিতাকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে বন্দী নামক এক মহাপণ্ডিতের সাথে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার কারনে। অষ্টাবক্র সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনিও তর্কযুদ্ধ করবেন পণ্ডিত বন্দীর সাথে। তাঁর মাতা ও মাতামহ তাঁকে বাধা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। অবশেষে অষ্টাবক্র ও তাঁর মামা শ্বেতকেতু রওনা হলেন রাজর্ষি জনকের সভার উদ্দেশে। উল্লেখ্য, শ্বেতকেতু সম্পর্কে অষ্টাবক্রের মামা হলেও তাদের বয়সের ব্যবধান ছিল খুবই কম। তাই তাঁরা দুজনেই ছিলেন নিতান্তই বালক।

যাইহোক ওরা জনকরাজার প্রাসাদে তো গেলেন কিন্তু দ্বাররক্ষী তাঁদের ঢুকতেই দিলো না। বললো—তোমরা নিতান্তই ছেলেমানুষ। জনকরাজার সভায় কেবল জ্ঞানী লোকেরাই ঢুকতে পারেন।

এ কথা শুনে অষ্টাবক্র বললো—আমরা সমস্ত বেদ ভালোভাবে পড়েছি, তাই বয়স কম হলেও আমরা জ্ঞানী। অতএব ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দিন। দেখি জনকরাজার সভায় কত বড়ো তার্কিক পণ্ডিত আছেন।

দ্বারপাল বললো—‘না না! তোমরা বড়ো ছেলেমানুষ। এ কাজ আমি করতেই পারি না।’

অষ্টাবক্র বললো—‘আপনি কে জ্ঞানী সেটা বয়স দিয়ে বিচার করবেন? না তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে বিচার করবেন? কারণ ভেবে দেখুন অনেকেই থাকেন যাদের বয়সের ভার বাড়লেও বুদ্ধিতে তাঁরা হাল্কাই থেকে যান। কখনোই জ্ঞানী হন না। যেমন তুলো গাছের ফল পেকে গেলেও হাল্কাই থেকে যায়।’

অষ্টাবক্রের কথায় দ্বারপাল মুগ্ধ হলেন। এবং ভিতরে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিলেন।

রাজসভায় এসেই অষ্টাবক্র বললেন যে তাঁরা সভার শ্রেষ্ঠ তার্কিক পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামতে চান। জনকরাজা বললেন—‘বেশ তো তার আগে আমার এই সামান্য ধাঁধার উত্তরটা দাও দেখি! বলো তো কি যাতে বারোটা ভাগে তিরিশটা টুকরো আছে, আবার চব্বিশটা ভাগে তিনশো যাটটা টুকরো আছে?’

অষ্টাবক্র সঙ্গে সঙ্গে বললো—‘অতি সহজ। একটা বছর। যা বারো মাসের ভাগে আর প্রতিটি মাস তিরিশ দিনের টুকরোয় ভাঙা। এটাই আবার তিনশো ষাট দিনে বারোটি পূর্ণিমা আর বারোটি অমাবস্যায় ভাঙা যায়।’

রাজা রীতিমতো বিস্মিত হলেন। তারপর বললেন— 'বলো দেখি—কোন প্রাণী ঘুমোলেও চোখ বোঝে না? কে জন্মানোর পরেও স্পন্দিত হয় না? কোন বস্তু বেগে বৃদ্ধি পায়?'

অষ্টাবক্র হেসে উত্তর দিলো—'অতি সহজ। মাছ ঘুমোলেও চোখ বোঝে না। ডিম জন্মেও স্পন্দিত হয় না। আর নদী বেগের দ্বারা বৃদ্ধি পায়।'

উত্তরগুলি শুনেই জনকরাজা বুঝলে, এ বালক হয়েও সত্যিই জ্ঞানী। তিনি বললেন—'অসাধারণ তোমার বুদ্ধি! তুমি অবশ্যই সভায় আসতে পারো। কিন্তু মনে রেখো সেখানে আছেন সর্বশ্রেষ্ঠ তার্কিক পণ্ডিত বন্দি। তাঁকে কেউ কোনোদিন তর্কে পরাজিত করতে পারেনি। আর তিনি যখন কাউকে তর্কে পরাজিত করেন, তখনই তাকে জলে ডুবিয়ে দেন। অতএব'—অষ্টাবক্র বললেন—'রাজা আপনি ভয় পাবেন না। উনি কখনো সেরকম কোনো পণ্ডিতের সামনে আসেন নি বলে এমন মিথ্যে ধারণা হয়েছে। আমার সঙ্গে তর্ক বিদ্যায় ওনার সব দর্প চূর্ণ হবে দেখুন।'

যাইহোক এইবার তো সভায় অষ্টাবক্র আর বন্দি মুখোমুখি হলেন। শুরু হোলো এক প্রবল তর্কযুদ্ধ।

বন্দি বললেন— 'আমি যা বলবো দেখি তুমি ঠিক তাঁর পরেরটা মিলিয়ে বলতে পারো কিনা। যেমন ধরো— সূর্য যদি এক হয় দুই বলতে কি বোঝো?'

অষ্টাবক্র সঙ্গে সঙ্গে বললো—'জগতে সূর্য একটি আর রথের চাকা দুটি।'

বন্দি বললেন—'তিন বলতে বোঝায় তিন ভুবন— স্বর্গ, মর্ত্য আর পাতাল।'

অষ্টাবক্র হেসে বললো—'পণ্ডিত আপনি তিনে যদি বলেন ভুবন, চারে তাহলে দিক/ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, আমার কথা ঠিক।'

বন্দি বললেন—'আমাদের শরীরে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়।'

এবার অষ্টাবক্র উত্তর দিলেন— 'পাঁচে ইন্দ্রিয় ছয়ে ঋতু / উত্তর দিলাম এই হেতু।'

বন্দি তখন একটু রেগে গিয়েই বললেন—'সাত বলতে বোঝায় সাত ঋষি অর্থাৎ সপ্তর্ষি। তাহলে আট বলতে কি বোঝো?'

অষ্টাবক্র হেসে বললো—'সপ্তর্ষি যদি হয় অষ্টবসু কেন নয়?'

শেষ পর্যন্ত তেরো নম্বরে এসে বন্দি নিজেই আটকে গেলেন নিজের কথায়। যেটা সম্পূর্ণ করলেন অষ্টাবক্র। অর্থাৎ তর্ক যুদ্ধে বন্দি পরাজিত হলেন। তখন জনকরাজা বললেন—'অষ্টাবক্র। তুমি বালক হয়েও সত্যিই জ্ঞানী। তাই বন্দিকে তুমি পরাজিত করতে পেরেছো। এখন সে তোমার অধীন। তুমি বন্দিকে এখন যেমন ভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারো।'

অষ্টাবক্র তার উত্তরে বললেন—'এই বন্দিকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং আমার ইচ্ছা ও যেভাবে সবাইকে তর্ক যুদ্ধে হারিয়ে জলে ডুবিয়ে দিয়েছে, ঠিক তেমনি ওকেও এক্ষুনি জলে ডুবিয়ে দেওয়া হোক। এটাই ওর উপযুক্ত শাস্তি।'

বন্দি বললো— 'জ্ঞানী অষ্টাবক্র। আপনার আদেশের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনার কথায় আমায় জলে ডুবিয়ে দিলে আমার মঙ্গল হবে। আমার পিতা স্বয়ং বরুণদেব। তিনি জলের দেবতা। তাই জলের নীচে গেলে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। বরং আপনার কথাতেই আমি জলের নীচে গিয়ে আমার পিতার কাছে পৌঁছাতে পারবো। তিনি আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন। আর হ্যাঁ। এর আগে যাদের আমি তর্ক যুদ্ধে পরাজিত করেছি, তাদের সবাইকে জলের নীচে পাঠিয়েছি বটে, কিন্তু কাউকে হত্যা করিনি। ওনাদের সবাইকেই পাঠিয়েছি আমার পিতা বরুণদেবের কাছে। কারন তাঁর বিশেষ যজ্ঞের জন্য কিছু জ্ঞানী ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল। ওনাদের সবাই এবার ফিরে আসবেন। আর জ্ঞানী অষ্টাবক্র, আপনার পিতা কহোড় মুনির সঙ্গে এবার আপনার দেখা হবে। ঠিক যেমন আমিও আমার পিতা বরুণদেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

''জ্ঞানের জন্য অষ্টাবক্রকে অভিশপ্ত হতে হয়েছিলো তার জন্মের আগেই। আর সেই জ্ঞান সার্থক হোলো যখন তিনি তার সেই অভিশাপ দেওয়া পিতাকে ওই জ্ঞান আর বিদ্যা দিয়েই উদ্ধার করলেন বন্দির হাত থেকে। পরবর্তীতে রাজর্ষি জনক অষ্টবক্র মুনির কাছে জ্ঞান, মুক্তি ও বৈরাগ্য লাভের উপায় জানতে চেয়েছিলেন। তার জিজ্ঞাসার উত্তরে অষ্টবক্র মুনি যা বলেছেন তা পরবর্তীতে অষ্টাবক্র গীতা নামে কুড়িটি অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে।

তবে এখানেই শেষ নয়। একটু পরেই জল থকে বেরিয়ে এলেন অষ্টাবক্র মুনির পিতা কহোড় মুনি। বেরিয়ে এলেন অন্যান্য পরাজিত ব্যাক্তিগনও। সন্তানের এই সাফল্যে কহোড় মুনি খুব খুশি হন এবং গর্ব বোধ করতে থাকেন। এরপর তিনি তাঁর পুত্রকে আশীর্বাদ করে বলেন যে, হে বৎস, সমঙ্গ নদীর জলে স্নান কর, তবেই তোমার অঙ্গবিকৃতি দূর হবে। একথা শুনে পিতাকে প্রনাম করে অষ্টাবক্র আবার বেরিয়ে পড়লেন সমঙ্গ নদীর খোঁজে। সমঙ্গ অর্থাৎ সমান গতিতে বয়ে চলে যে নদী। বহুকাল ধরে পথ চলতে লাগলেন এই মহাজ্ঞানী অষ্টাবক্র। সেইসময় সূর্যবংশ তথা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যে বংশে জন্মগ্রহন করেছিলেন, সেই বংশ পুরুষশূন্য হয়ে নির্বংশ হতে বসেছিল। ব্রহ্মার অনুগ্রহে এই বংশে রাজা ভগীরথের জন্ম হয়েছিল বৈকি কিন্তু তাঁর শরীর ছিল অস্থিশূন্য। রাজা ভগীরথের জন্ম হয়েছিল তাঁর মাতা ও বিমাতার মাধ্যমে। কোন পুরুষের ঔরসে জন্ম না হওয়ার ফলে তাঁর শরীরে কোন অস্থি বা হাড় ছিল না। তাই তাঁর চলাফেরার ধরন ছিল অনেকটা অষ্টাবক্রের মত। অষ্টাবক্র যখন পিতার নির্দেশমত সমঙ্গ নদী খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সেসময়ই একদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে ভগীরথের। তিনি দেখলেন তাকে ব্যাঙ্গ করে কেউ একজন ঠিক তাঁর মত করেই পথ চলছেন। এ দেখে ভয়ংকর রকমের ক্রুদ্ধ হলেন অষ্টাবক্র। তিনি বললেন, যদি এই ব্যাক্তি আমাকে ব্যাঙ্গ করে থাকে তাহলে এখনই সে আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাক। আর যদি সে সত্যিই বিকলাঙ্গ হয়ে থাকে তাহলে আমার আশীর্বাদে সে সুস্থ স্বাভাবিক শরীর প্রাপ্ত হোক।

ঋষি অষ্টাবক্রের আশীর্বাদে তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক শরীর প্রাপ্ত হলেন রাজা ভগীরথ। এরপর তিনি স্বর্গের গঙ্গাদেবীকে মর্ত্যে এনে সাগর রাজার ষাট হাজার বংশধর তথা তাঁর পূর্বপুরুষদেরকে কপিলমুনির অভিশাপ থেকে মুক্তি দিলেন। এছাড়াও সূর্যবংশকেও নির্বংশ হওয়ার হাত থেকে বাঁচালেন রাজা ভগীরথ। এর মাধ্যমে তরান্বিত হল শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম।

যাইহোক রাজা ভগীরথকে আশীর্বাদ করে আবারও পথ চলতে লাগলেন অষ্টাবক্র। সমঙ্গ নদীর খোঁজ করতে করতে অজানা এক গ্রামে এসে হাজির হন তিনি। সেই গ্রামে জনবসতি ছিল না বললেই চলে। চারপাশটা ছিল ঘন জঙ্গলে ঘেরা। এইখানে ঘুরতে ঘুরতে একটি শিবলিঙ্গের সন্ধান পান অষ্টাবক্র ও এই লিঙ্গের সামনে গভীর সাধনায় মগ্ন হন। এরপর শিবের অনুগ্রহে পূর্বদিকের জঙ্গলের মধ্যে তিনি আটটি কুণ্ডের সন্ধান পান। তিনি লক্ষ করেন তার মধ্যে সাতটি কুণ্ডের জল গরম এবং একটি কুণ্ডের জল ঠান্ডা। তিনি এই ৮ কুণ্ডের জল যেখানে মিশছে, সেখানে স্নান করেন তিনি। এর ফলে তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দূর হয় এবং তিনি বক্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হন। পরে অষ্টাবক্রের নামানুসারে সেই শিবলিঙ্গের নামকরণ হয় বক্রনাথ, এবং সেই গ্রাম বক্রেশ্বর নামে পরিচিতি পায়।

না থাকিলে খানাখন্দ

বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়

গান শেষ হতেই হাততালিতে ফেটে পড়ল গোটা হল। গায়ক তপন পাল মাথা ঝুঁকিয়ে বো করলেন। পরের গানের জন্য ম্যান্ডোলিনে পুড়ুংপাড়ুং করতেই চিৎকার উঠল, 'আর একবার, আর একবার।' তপন পাল পিছন ফিরে মিউজিশিয়নদের বলছিলেন, 'মুসাফির ফিরে আয় গানটা গাইব। রিদমটা একটু বাড়াবি।' কিবোর্ডে ছিল শুভঙ্কর। বলল, 'পাবলিক চেঁচাচ্ছে দাদা। শুনুন কী বলছে?'

মুশকিল হচ্ছে, স্টেজে প্রোগ্রাম করার সময় অডিয়েন্সে কে কী বলছে, তার প্রায় সিংহভাগই শোনা যায় না বা বোঝা যায় না। দু'একটা কথা শুনে একটা আলগা আন্দাজ করে নিতে হয়। কিন্তু তপন পাল তা করলেন না। সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলছ তোমরা?'

বিপ্লবী ডহর কলেজের ফ্রেশার্স অনুষ্ঠানে প্রথম থেকেই একটা টালবাহানা চলছিল আর্টিস্ট সিলেকশন নিয়ে এ ইউনিয়ন বলে এই আর্টিস্ট লাগবে। তো ওই ইউনিয়ন বলে, চলবে না, অন্য শিল্পী চাই। কেউ কারোর ধার ধারে না। আসলে, সমস্যাটা অন্য জায়গায়। এ বছরের ইলেকশনে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটেছে! দুটো পার্টি সমান ভোট পেয়েছে। তার জন্য আগের চারবারের বিজয়ী ইউনিয়ন ইভিএম-এর কারচুপির অভিযোগ তুলে দু'দিন কলেজ বন্ধের ডাক দিয়েছিল। বনধ সফল। ছুটি পেলে সাধ করে কে আর আসে! কফি হাউস, ইলিয়ট পার্কের ঝোপ, সিনেমা হল ভরে গেল ছাত্রছাত্রীতে। তৃতীয় দিন আবিস্কার হল, আরে, কলেজের ভোটে ইভিএম মেশিন কোথায়! পাতি ব্যালট পেপারে ভোট হয়েছিল তো! পরের দিন হই-হই করে কলেজ শুরু হয়ে গেল।

ফাংশন নিয়ে টানা দু'দিন টানাটানির পর মোটামুটি একটা সমঝোতা হল। তার অন্যতম ফসল এই তপন পাল। একটু পুরনো আর্টিস্ট হলেও বছর খানেক ধরে নিজেকে আপডেট করেছেন। উন্নয়নমুখী গান গাইছেন। সে উন্নয়ন পতাকা দেখে না। উন্নয়ন হলেই হল। এই যেমন, 'যতই নাড়ো কলকাঠি বাঁচতে গেলে দাওয়াই চটি', আবার অন্যদিকে, 'দেখেছো কী কাণ্ড, ঝেড়ে দিল লক্ষ্মী ভাণ্ড!' ইত্যাদি-ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

মাইকটা নিয়ে একটু এগিয়ে এলেন তপন পাল। ঈষৎ খোনা গলায় (ওটাই ওঁর ইউএসপি) বললেন, 'কী বলছ তোমরা? পরের গানে যাই?' হই-হই করে উঠল গোটা হল, 'গুরু, আর একবার আগের গানটা গাও।' সেই চিৎকার বিপুল তরঙ্গের মতো প্রবাহিত হল 'এ' থেকে 'জেড' রো পর্যন্ত। হেসে ম্যানেজ দিলেন তপন পাল। 'দেখো, প্রোগ্রামটা তোমাদের। ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকেছ সদ্য। তোমাদের অনুরোধ অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু আমার আরও বহু গান আছে!' কোলাহলে উত্তাল হলো হল, 'আগেরটা আর একবার।'

ফের আগের গানটাই ধরলেন তপন পাল, 'না থাকিলে খানাখন্দ, হবে যে মাল্লু বন্ধ/ দাদা দিদির দ্বন্দ্ব সামলানো যাবে না/ বলি, মানীর money কাটা হবে না।' স্টুডেন্টরা আনন্দে ফেটে পড়ল। সুঁই-সুঁই সিটি, হাততালি, ফাংশন জমে ক্ষীর।

গ্রিনরুমে সোফায় পিঠ ঠেকিয়ে বসল জয়েন্ট জিএস অনিন্দ্য-সুন্দর। দু'জনেই সিগারেটের প্যাকেট বের করে একে অপরকে অফার করল। দু'জনেই দু'জনেরটা নিল। ধরাল। অনিন্দ্য গত বছর দল বদল করে এ ইউনিয়নে এসেছে। সুন্দর এ ইউনিয়ন থেকে ওই দলে গেছে। ধড় এক, ছালটা আলাদা। লম্বা-লম্বা দুটো টান দিয়ে অনিন্দ্য চারদিক দেখে বলল, 'খামগুলো রেডি করেছিস?' মাটিতে ছাইটা ঝেড়ে সুন্দর বলল, 'তা করেছি। এবার তো মাল ঢোকাতে হবে। সব তো ফাঁকা।' অনিন্দ্য বলল, 'দেখ, আগেই তো তোর সঙ্গে রফা হয়েছে, প্রোগ্রামের হল, রিফ্রেসমেন্ট, সাউন্ড সিস্টেম আমার। আর্টিস্ট, কনভেন্স, ডেকরেশন তোর। এলেম অনুযায়ী খিঁচে নাও। কাটমানির কোনও কাটাকাটি হবে না।'

হলে তখন মারমার কাটকাট অবস্থা। একদল ছেলে স্টেজের সামনে এসে উদ্দাম নাচছে। বাকি হল ফুটছে টগবগ করে। মঞ্চে তপন পালের গায়ে সেই উত্তেজনার ছোঁয়া লেগেছে। ঘুরে-ঘুরে, নেচে-নেচে গাইছেন তিনি, 'না থাকিলে ভাঙা ব্রিজ/ বিয়ারে ভরবে না ফ্রিজ/কপালকুণ্ডলা মাহেশে মালা বেচবে না/ বলি, মানীর money কাটা হবে না।'

পকেটে গুড়গুড়-গুড়গুড় করে মোবাইলটা বেজে উঠল সাগরনীলার। একরাশ বিরক্তি নিয়ে বের করে দেখল, 'সুন্দরদা কলিং'। 'হ্যাঁ বলো!' সুন্দর বলল, 'হলের বাইরে আয়, দরকার আছে।' বাইরে গেল সাগরনীলা।

‘হ্যাঁ, বলো, হঠাৎ জরুরি তলব?’ সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে সুন্দর বলল, ‘কালচারাল সেক্রেটারি হিসেবে তোর তো জয়জয়কার।’ হেসে সুন্দরের বুকে গড়িয়ে পড়ল সাগরনীলা, ‘সব কুছ তুমহারে লিয়ে।’ সুন্দর বলল, ‘তা আমার কমিশন কোথায়?’ সাগরনীলা বলল, ‘বলো কী চাই?’ সাগরনীলার ডান কানের লতিতে চুটুস করে একটা টোকা মেরে সুন্দর বলল, ‘চল, শান্তিনিকেতন যাই!’ সাগরনীলা বলল, ‘যেটার জন্য যেতে চাইছ, সেটা এখানেই শান্তিতে হয়ে যাবে।’ সুন্দর অবাক, ‘মানে?’ সাগরনীলা বলল, ‘এই শনি রবিবার বাড়িতে কেউ থাকছে না। তারাপীঠে যাচ্ছে। আমাদের বাড়ি নরেন্দ্রপুরে। চিন্তামণি কর পাখিরালয়ের পিছনেই। শোওয়ার ঘর থেকে মনে হবে গভীর অরণ্যের মধ্যে তুমি ‘ঘুঘু সই, দাওখান কই’ করছ। আমি খরচ হলেও তোমার কোনও খরচ নেই।’ হলের ভিতর থেকে ভয়ঙ্কর শব্দ ভেসে এল। দৌড়ে চলে গেল সাগরনীলা। সুন্দর আর একটা সিগারেট ধরাল। ঘুঘু সই! তাই সই!

হলে যেন দক্ষযজ্ঞ চলছে। সিটের ওপর দাঁড়িয়ে সবাই নাচছে! স্টেজের সামনে ভিড়ে ভিড়াক্কার! ঘনঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছেন তপন পাল। কেরিয়ারে অনেক কলেজ ফাংশন করেছেন, এমনটা কোনও কলেজে হয়নি। গর্বে কলজে ফুলে-ফুলে উঠছে। ম্যান্ডোলিনে পুড়ুং-পুড়ুং করে মিউজিশিয়ানদের বললেন, ‘মুসাফির ফিরে আয় গানটা এবার গাইব।’ প্রবল চিৎকারের মাঝে কিবোর্ডিস্ট শুভঙ্কর বলল, ‘ওদিকে দেখুন, কী বলছে!’

‘গুরু, গানটা আর একবার, আর একবার।’ এবার সত্যি অবাক তপন পাল। তার দীর্ঘ পঁচিশ বছরের শিল্পী জীবনে অনেক রকম ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এমনটা হয়নি! গত সপ্তাহেই বিপ্লবী সিধু কলেজে অনুষ্ঠান করেছে এবং ফাটিয়ে দিয়েছে। আগের মাসে বিপ্লবী কানু কলেজে তো ক্যান্টার করে দিয়েছিল। কিন্তু এবার বিপ্লবী ডহরে এসে...!

‘কী বলছ তোমরা!’ একটু বিপ্লবের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন তপন পাল। হল থেকে শব্দের হলকা ছিটকে এল, ‘এই গানটা আর একবার গাইতে হবে।’ প্রত্যেকটা গানের মাঝেই মিউজিশিয়ানরা ফুটুংফাটুং, পিড়িংপিড়িং, ঢাপুসঢুপুস করে। বেগতিক বুঝে সবাই থমকে গেছে। তপন পাল বললেন, ‘একটু চুপ করো, চুপ করো। একটা গান তোমাদের রিকোয়েস্টে পরপর দু’বার গাইলাম। আমার তো আরও হিট গান আছে। সেগুলো শোনও তোমরা। আমি...’

কথা শেষ হওয়ার আগেই ব্যাপক চিৎকার শুরু হল। একদল ছেলে স্টেজে ওঠার চেষ্টা করছে। কেউ-কেউ তাদের টেনে নামাচ্ছে। মেয়েরাও কম যায় না। হলের সিট প্রায় ভেঙে ফেলার জোগাড়। ততক্ষণে জয়েন্ট জিএস অনিন্দ্য আর সুন্দর স্টেজে উঠে পড়েছে। একজন তপন পালের মাইক, অন্যজন তবলচির মাইক নিয়ে সবাইকে শান্ত হতে বলছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! চিৎকার প্রচণ্ড গর্জনে আছড়ে-আছড়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির ছেলে বোধহয় তার পাপাকে ফোন করেছিল। বাড়িতে ডাকাত পড়লে হাজার ডাকলেও নড়েচড়ে বসে না! এখানে মনে হয় যেন রাস্তার মোড়ে বসে চা বিস্কুট খাচ্ছিল বদগুলো। মুহূর্তে সাইরেন বাজিয়ে গাড়ি এসে থামল গেটের বাইরে। একদল পুলিশ দৌড়ে ঢুকল। ফুরুর-ফুরুর বাঁশি।

ব্যাপারটা খুব একটা বুঝতে পারছে না জয়েন্ট জিএস! একজন শোওয়ার সন্ধানে ব্যস্ত ছিল, অন্যজন গ্রিনরুমের বাথরুমে সায়ন্তনীর সান্নিধ্যে। তপন পালের কাছে গিয়ে দু’জনেই বলল, ‘বলছে যখন গান না গানটা, পবলেম কী!’

এবার সংযমের বাঁধ ভাঙল তপন পালের, ‘মানেটা কী! পয়সা দিয়েছ বলে কী যা খুশি তাই করাবে? আমি কী পাড়ার দুর্গাপুজোর ঢাকি নাকি? সেক্রেটারির মেয়ে গাইবে, বাজাতে হবে, ট্রেজারারের বউ নাচবে, ঢ্যাঙ্কুনাকুড়-ঢ্যাঙ্কুনাকুড় করতে হবে! ইয়ার্কি হচ্ছে!’

ততক্ষণে পুলিশের দু’জন মঞ্চে উঠে পড়েছে। ফুরর...ফু, ফুরর...ফু করে বাঁশিটা কেন বাজাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না! বাঁশি পেলই বা কোথা থেকে! অ্যান্টিক মাল! তাছাড়া এখন তো পুলিশ বাঁশি বাজায় না, প্রিজন ভ্যান বাজায়! স্টেজে পুলিশের সঙ্গে গোটা বিশেক ছাত্রছাত্রীও উঠেছে। উইংসের পাশের মঙ্গলঘট গড়াগড়ি খাচ্ছে। একটি মেয়ে আবার ফুলের মালা ছিঁড়ে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিচ্ছে। গিটারবাদক তার গিটারটা নিয়ে ফাঁকতালে কেটে পড়ার চেষ্টা করছিল। ধরে ফেলল একজন। ধমকে বলল, ‘ফাক ইউ। গিটার তোর গাঁ..., সরি, পিছনে...’

বিধ্বস্ত তপন পাল। মাইকটা নিয়ে এগিয়ে এলেন। ‘ঠিক আছে। গাইছি, গাইছি। কিন্তু কেন? পরপর তিনবার কেন, হোয়াই!’

চিৎকার উঠল হল জুড়ে, ‘একবার, অন্তত একবার ঠিকঠাক সুরে গাও গুরু। তারপর না হয় অন্য...’

মাথা ঘুরে ঢপাত করে পড়ে গেলেন তপন পাল।

গুড়গুড়-গুড়গুড় করে কার্টেনও পড়ল।

অনুভূতি

জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

এগুলো কবিতা নয়, হয়ত অনুকবিতাও নয়, হয়ত সেই অর্থে স্লোগানও নয়... এগুলো একজন সাধারণ মানুষের অনুভূতি... কলকাতার একটা নৃশংস, পৈশাচিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, মনের গভীর থেকে উঠে আসা অনুভূতি... কিন্তু, শুধুমাত্র কী আর জি করের ঘটনা? এর আগে, পার্ক স্ট্রিট রেপ কেস, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, বারাসত, মালদা, হাঁসখালি, সন্দেশখালি, বগটুই... ওদিকে সুদীপ্ত গুপ্তের মৃত্যু? আনিস খানের মৃত্যু? সুঁটিয়ার বরুণ বিশ্বাসের হত্যার সময় তো নাকি প্ল্যাটফর্মের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল... তারপর চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনে এসে পুলিশের লাঠির বাড়িতে মৃত্যু হল মইদুল মিদ্যার। আসলে একের পর এক ঘটনায় আমরা আর পারছিলাম না...হঠাৎই এই খবর, সরকারী হাসপাতালে ছত্রিশ ঘণ্টা ডিউটি দেবার পর একটা ডাক্তার মেয়েকে অনেকে মিলে, আঁচড়ে কামড়ে, ছিঁড়ে মেরেছে... এক-একদিন, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হু-হু করে কান্না বেরিয়ে এসেছে... আজ সাধারণ মানুষ পথে বেরিয়ে এসেছে... আর নয়... আর সহ্য নয়... যা লিখেছি, তার কোনও ব্যাকরণ নেই, বিজ্ঞান নেই, আছে শুধু আবেগ, কান্না...

১০ই অগাস্ট, ২০২৪

শনিবার

“খুব কষ্ট পেলি না? কাঁদলি?
তোর হাতটা দে, রাখ আমাদের হাতে।
ঐ দেখ—তোর মরণে জেগেছি আমরা,
বেরিয়েছি আজ পথে”

১৪ই অগাস্ট, ২০২৪

“ওঠ রে জননী
পোহায় রজনী,
ভরেছে পাপের ঘড়া
যাবতীয় কাজ,
ছেড়ে দিয়ে আজ,
শুধু প্রতিবাদ করা”

১৪ই অগাস্ট (মধ্যরাত্রি), ২০২৪

“ওরে ও একলা মেয়ে, পথ-চলতি
অন্ধকারে, ভয় কী রে তোর?
ঐ দ্যাখ, কাটছে আঁধার
ফর্সা আকাশ, হবেই ভোর”

১৫ই আগস্ট, ২০২৪

“JUSTICE” শব্দটাতে প্রশাসনের ভয়,
“JUSTICE” ছাড়া কোন কথা নয়

২৯শে আগস্ট, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ৪০ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—২০ দিন আগে।
“বুকের মধ্যে ফুটছে রক্ত,
চোয়াল ক্রমে হচ্ছে শক্ত।
বড়ো বড়ো উকিল ধরো?
কাদের টাকায় বলতে পারো?”

৩০শে আগস্ট, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ৩৯ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—২১ দিন আগে।
“শুধু একজন রোজ যাওয়া-আসা করবে?
খুনীরা সমাজে “খোলা ঘুরে বেড়াবে?”

১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ৩৭ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—২৩ দিন আগে।
ওরা নৃশংস, ধুরন্ধর।
ওরা ধর্ষক, খুনী বর্বর,
ধর ধর, ওদের ধর।
(সবাই মিলে গলা ছেড়ে)
জাস্টিস ফর আর জি কর

৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ৩৫ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—২৫ দিন আগে।
''ডাক্তাররা মিছিল করেন 'শিরদাঁড়া' নিয়ে।
'উনি' পালান পিছন দিকের দরজা দিয়ে।''

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ৩৪ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—২৬ দিন আগে।
''ডাক্তার, ও ডাক্তার একটু দাঁড়া।
তিনি যে ভেগেছেন শিরদাঁড়া ছাড়া।
তোরা তো গেছিলি ফেরত দিতে,
উনি নাকি নিয়েছেন নিজ হাত পেতে!!''

৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ৩৫ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—২৫ দিন আগে।
''কিছু একটা হচ্ছে
সবাই কী বুঝতে পারছে?
আমার জীবনে এমন ঘটেনি।
এমন আন্দোলন কোনদিন দেখিনি।
এইভাবে একসাথে রাজপথে হাঁটিনি।
রাত জাগিনি।

কিছু একটা ঘটছে—
সবাই কী ধরতে পারছে?''

৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ৩২ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—২৮ দিন আগে।
''মন বোঝে না কোনোটাই—
সুপ্রীম কোর্ট বা সিবিআই/
মন শুধু বলে—
জাস্টিস চাই... জাস্টিস চাই//''

৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ৩০ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—৩০ দিন আগে।
''মা বলছেন— চারিদিকে আজ মানববন্ধন,
নিবিয়ে দাও সব আলো
দিকে দিকে আজ প্রতিবাদ মিছিল
চিতার কাঠে মশাল জ্বালো।
মেয়ে বলছে—জানি মা, সব জানি
ভয় শুধু,
আর একটা না হয় কামদুনি।

৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ২৯ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—৩১ দিন আগে।
''ঘুমের মধ্যেও বিড় বিড় করে যাই—
'বিচার চাই... বিচার চাই।'
ঘুমের মধ্যেও কানে আসে স্বর
'জাস্টিস ফর আর জি কর'
সত্যি! আর যাচ্ছে না পারা
বিচার এখনো অধরা''

১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ২৮ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—৩২ দিন আগে।

''দাঁতে দাঁত ঘষছি—
অপেক্ষায় প্রহর গুনছি
বলি, 'এসব' কী হচ্ছে?
শুধু সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।।"

১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ২৬ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—৩৪ দিন আগে।

''রাত জাগছে শহর,
চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে
একটাই স্বর—
বিচার আমরা দেবই—
আর জি কর।।"

১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ২৪ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—৩৬ দিন আগে।

''তুমি ভয় পেয়েছো তাই
ভাবছো মনে, 'চেয়ারটাকেই চাই',
কিন্তু জেনো, ওরা অনেক
উদার, অনেক বড়ো
চেষ্টা করো,
যদিও ওদের মতো
হতে পারো।"

১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ২৩ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—৩৭ দিন আগে।

ধরা পড়ে গেছে সব 'অভিনয়-ভান',
ওদের প্রতি আপনার নেই কোনো
'ভালোবাসা-টান',
ভালো করে বুঝে নিন—
কোর্টের কোন 'বাধা' নেই—
ভিডিও রেকর্ডিং
বা
লাইভ স্ট্রিমিং।।"

১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ২২ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—৩৮ দিন আগে।

''প্রতিবাদের ঢেউয়ে ভেসে চলে যাই—
'জাস্টিস' ছাড়া আর কিছু চাইবার নাই।।"

১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ২৯ দিন পর
মেয়ে চলে গেছে—৩০ দিন আগে।

কেউ বলছে 'জয়', কেউ বলছে 'হার'
প্রশ্ন উঠছে—'অপসারণ'? 'পদত্যাগ'?
নাকি 'পুরস্কার'?
শুধু মন বলছে— 'কই বিচার'?
'কই বিচার'?"

২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ১৮ দিন পর

মেয়ে চলে গেছে—৪২ দিন আগে।

‘‘অনেক সংগ্রাম করলি, ভাই,
এবার মশাল বাড়িয়ে দে—
আমরা বয়ে নিয়ে যাই।
‘অপরাধীরা সব্বাই’ ধরা পড়লো কই?
গ্রেপ্তার চাই, সিবিআই,
‘সব্বাইকে’ ধরা চাই।’’

২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ১৭ দিন পর

মেয়ে চলে গেছে—৪৩ দিন আগে।

‘‘রাত বাড়ছে—রাজপথ জাগছে—
ঐ মিছিল এগিয়ে আসছে।
লক্ষ কণ্ঠে সমস্বর
বিচার দেবোই—বিচার দেবোই—
আর জি কর

২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ১৬ দিন পর

মেয়ে চলে গেছে—৪৪ দিন আগে।

‘‘ঠাকুমা ওঠো, যাবে না মিছিলে?
পা মেলাবে না রাজপথে?’’
—‘‘হ্যাঁ চল, অশক্ত শরীর, দুর্বল,
তবু কিনেছি গোলাপ ফুল,
তুলে দেবো, ছেলেমেয়েদের হাতে।’’

২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ১৪ দিন পর

মেয়ে চলে গেছে—৪৬ দিন আগে।

‘‘কেন পিছোলো শুনানি?
মনে রাখবেন, আমরা কিন্তু
অপেক্ষায় দিন গুনি...’’

২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ১২ দিন পর

মেয়ে চলে গেছে—৪৮ দিন আগে।

‘‘থমকায়নি মিছিল, শেষ হয়নি মানববন্ধন,
চলবে জমায়েত, থাকবে চিৎকার—গর্জন।
মনে রেখো, থেমে যায়নি স্বর।
আমরা সবাই আছি—
সবাই আছি—আর জি কর।।’’

২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ১০ দিন পর

মেয়ে চলে গেছে—৫০ দিন আগে।

‘‘নিষেধাজ্ঞা জমায়েতে? ‘না’ মিছিলে?
ওহে— নয়ই আগস্ট, কী করছিলে?
চোদ্দ-ই আগস্ট, তোমার আজব
আইন কোথায় ছিলো?
যেদিন গুন্ডারা, হাসপাতাল-টাকে
ভাঙছিলো?’’

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪

কাউন্ট ডাউন ঃ মা আসছেন ৮ দিন পর

মেয়ে চলে গেছে—৫২ দিন আগে।

‘‘মিছিল যত বড় হচ্ছে, জনগর্জন তত বাড়ছে—
অভয়ার চিতার আগুনে মশাল—হাতে হাতে জ্বলছে।’’

প্রবাসীদের কলমে

প্রবন্ধ

সরকার ও দ্রুত উপার্জন

মৃদুল পাঠক

নিউ ইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সরকার ও দ্রুত উপার্জন

সরকার ছাড়া গতি নেই। যতই মুক্ত অর্থনীতি কপচান—আমেরিকা, ইউরোপ দেখান। অ্যাডাম স্মিথ-এর জাত ভাইরা বহু কাল আগেই Outsourcing করতেন। কয়েদি, আসামি, বোম্বেটে—এই নাও লাইসেন্স—মুক্ত বাণিজ্য বা ডাকাতি—জলে, স্থলে ভাগ করে দাও—আধা সরকার, আধাভুক্তি, প্রোটেকশন মানি? সিন্ডিকেট মানি? আজ্ঞে হা। বিজনেস কলেজে এটা পড়ানো হয় না। পড়ানো উচিত। বেড়ালের মতো সরকারের চারিদিকে—মন্ত্রণালয় থেকে পঞ্চায়েতে—ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়ান। ঠিক—মাছটা, দুধটা পেয়ে যাবেন। বখরা ফর্মুলা প্রয়োগ করলে চরচর করে আপনার উত্থান। না হলে? ঋষিকেশ মুখার্জির বলিউডি ফিল্ম কায়দায়—গোলমাল ভাই সবই গোলমাল। দ্রুত পতন। জেলবাস।

তারপর অবশ্য সমস্যা নেই। জেল ফেরত আসামি চৌদ্দপুরুষ বহাল তবিয়তে জীবনযাপন—কোন সমস্যা নেই। সমাজ ভুলিয়ে দেবে। আজীবন কারাদন্ড আসলে আজীবন নয়—

সরকার ও ধৈর্য

আপনার প্রজেক্টটা দারুণ। দেশের উন্নতি—বেকারদের চাকরি—অর্থনিবেশ—পরিবেশ উন্নয়ন। সামাজিক উন্নয়ন—বিদেশী সমাগম— Infrastructure development সব টু দি পয়েন্ট। চলে যান সাক্ষী নিয়ে, মন্ত্রালয়। বিশাল কামরা, বিশাল চেয়ারে বসে বাবুমশাই বিজ্ঞর মত কিন্তু আপনাকে বিশ্বায়ন ও অর্থনীতির জ্ঞান দেবেন (ফাইলটা দেখার পর)। আপনার দু'বছর লেগেছে লিখতে ত' কি হয়েছে—উনি দু মিনিটেই বুঝে গেছেন। আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

Scene no. 1 পুরোটাই হিমশীতল অন্ধকার

Scene no. 2 একজন ভেতরকার লোক আসবে আপনার কাছে

Scene no. 3 সরকার ওই কাজটাই করবে নিজেরা

Scene no. 1 And 3. একে অপরের পরিপূরক

Scene no. 2 আনি-দুয়ানি অথবা লাল-বাল চাই

আপনি ত' মশাই কিছুই বুঝতে পারেন না। এটা বাংলা। ভারতবর্ষের একটি ব্যতিক্রমী প্রদেশ—আপনার disqualification আপনি বাঙালি, আপনি বাংলা বলেন, সাহিত্য করেন, গান বাজনা বোঝেন, বড্ড morality দেখান—আবার পূজা আর্চা করেন। না, মশাই। আপনার দ্বারা হবে না। আপনি এক আনি-দুয়ানি নিয়ে আসুন। নিদেন পক্ষে গুপ্ত থেকে গুপ্তা। ও রাজনীতি পুর সম্প্রদায়ের প্রানপন বাধাদান সত্ত্বেও।

নিঃশব্দ বিপ্লব

পরিসংখ্যান ভিত্তিক পর্যালোচনা করার জন্য গবেষকরা আছেন। খালি চোখে ১৯৯৫ থেকে ২০২৫ বাংলা বা কলকাতায় যারা কেবল অবক্ষয় দেখতে পান—রাজনৈতিক ছায়া—তারাও কিন্তু আর অবহেলা করতে পারছেন না।

বিশ্বের আনাগোনা বাংলায়। ভারী শিল্পই কেবল রক্ষাকর্তা—তা কলকাতায় কান পাতলে বোঝা যায়—কেন নিউইয়র্ক শিকাগো বা টেক্সাসের থেকেও মার্কিন অর্থনীতির ধারক ও বাহক—ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র শিল্প। পরিযায়ী শ্রমিক শুনেছি—পরিযায়ী অর্থনীতি বাংলাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কার্শিয়াং কালিংপং গ্যাংটক শিলিগুড়ি থেকে নেবে বীরভূম বর্ধমান হয়ে নিউটাউন রাজারহাট হয়ে বানতলা বা কুলতলী বা আরো দক্ষিণে যান—দৃশ্যমান বা অদৃশ্য বর্ধিষ্ণু সমাজ—একদিকে শিক্ষিত শ্রমিকের দেশত্যাগ—ব্যাঙ্গালোর বা বিদেশ। অন্যদিকে দেশত্যাগে অনিচ্ছুক বাঙালি বা অবাঙালির ক্রমবর্ধমান wealth creation কলকাতা ও বাংলার চারিদিকে। কীভাবে? গবেষকরা ডেটা বা এভিডেন্স খুঁজে বেড়াবেন। কিন্তু নিতান্ত অন্ধ না হলে সামাজিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে অর্থনৈতিক উত্তরণের ছবিটা দেখতে পাওয়া যায়—নিঃসন্দেহে।

চৌর্য্য বিপ্লব

ব্যবসার উদ্দেশ্য কি? অর্থনৈতিক। তার নানা প্রকার পথনির্দেশিকা আছে। অধুনা বাংলার এবং আগত দ্রুততম উত্থান ও পতনের নাম হলো—চৌর্য্য বৃত্তি। চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। মধ্যবিত্ত বঙ্গসন্তানের কর্ণযুগলে অনির্বাণ বর্ষণ হয়েছে—লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়া

করে সে। কিন্তু সে ত' প্রাক স্বাধীনতা যুগে, একবিংশ শতাব্দীতে পরিযায়ী হওয়া ছাড়া গতি নেই। না মশাই না। আধুনিক সাম্প্রতিক যুগের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। মন্ত্রী হন কি পাড়ার বখাটে ছোকরা হন—এই একটা পেশায় ইদানিং বাঙালি বিশাল কৃতিত্ব দেখিয়ে চলেছেন। মারি ত' গন্ডার লুঠি ত' ভান্ডার। যেন তেন প্রকারেণ খাটের তলা, চিলেকোঠায়, গ্যারেজে—টাকার বান্ডিল সাজিয়ে রাখুন। SUV এর ডিগ্রিতেও। কি করে? গাছের ডাল নাড়িয়ে? নৈব নৈব। সে বুদ্ধি বঙ্গ সন্তানের আছে। একটাই ফর্মুলা—''মানুষ মানুষের জন্য...'' গানটি মনে আছে, লেগে পড়ুন—হাসপাতালে, স্কুলে, গ্রামে, যেখানে যাকে পাবেন—লোভ দেবেন, লোভ করুন। পারবেন!

সর্বনাম

উদ্দালক ভরদ্বাজ
সিনসিনাটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

তুমি আর আমি
আর কোন সর্বনাম নেই
তুমি আর আমি
বন্ধু, হাত বাড়ালেই।

তুমি আর আমি
স্বপ্নের কুড়নো ধুলো
ঘেঁটে দেখি, সোনার সূর্য
ঢেকে রেখেছিল মেঘগুলো...

মেঘে মেঘে চলে গেল বেলা
তুমি, আমি, দুদিনের খেলা
ফুরল, এবার ফিরে যাওয়া,
তুমি আমি যত চাওয়া পাওয়া—

ছুঁয়ে দেখি ভাঙেনি কিছুই
মন, ক্ষণ, নিরুপম ঠোঁট
নামে নাম মিশে যায়, মেঘে
বৃষ্টির ফোঁটারা একজোট

লিখে নিয়ে জলের আদলে

তোমার আমার এই নাম
নিশুত রাত্রির গায়ে
ঝরায় শিশির অবিরাম।

মাটি আর মনের চাতাল
শিশিরে শিশিরে বয়ে যাক
তোমার আমার মোহ নাম
তারায় তারায় লেখা থাক

রাতের ট্রেন

তাপস কুমার রায়
সিনসিনাটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

রাতের ট্রেনে ঝম্ ঝম্ ওঠাপড়া
ঘুম এল কী এলো না স্টেশনেরা আসে যায়

স্টেশন পেরোলে নীল, ও কার মুখ আলোর মায়ায়

একটানা ক্লান্তির রুল টানা রুটিনে ফেরে চরাচর
চাকাগুলো বগি নিয়ে ঝিকঝিক আগুনের ফুলকি
ইস্পাতের কঠিন পাতে চাকা ঘষে ঘষে
সভ্যতার অনন্ত অস্তিত্ব ক্রমাগত আনবাড়ি যায়

একা চাঁদ মিঠে হেসে
জেগে থাকে তোমার আমার জানালায়

অনুভব

তপনজ্যোতি মিত্র

সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

বসন্ত এসে বলে গেছে যদি যাওয়া—
দিগন্ত রাখো দুঃখদিনের শেষে,
বিষাদ রঙে সেজেছে শহর মায়া!
নদীকে ডেকেছে সাগরে মিলে এসে।

অলীক জ্যোৎস্নায় করেছে মন ভারী,
ঘরবাড়িদের বিষণ্ণ অনুভবে,
মিলে যদি যায় দু-হাত ছাড়াছাড়ি!
মাধবী এসে ডেকেছে যেন কবে।

এই হাহাকার মিলিয়ে দিয়েছে সাগর,
বালিয়াড়ি জুড়ে ম্লানতম বালিখেলা,
কবি হেঁটে গেলে ম্লান রাত্রির জাগর!
শহর বন্দর মিলে গেছে কোন মেলা।

মানুষের চোখ ভিজে গেছে কোন জলে,
মানুষের মুখ দেখেছে অসীম আকাশ,
পাথর ভেঙে ঝর্ণার জল বলে—
মল্লার যেন মেলায় গোধূলি আভাস।

উজান থেকে মোহনার দিকে গেল কারা?
হিরণ্য দ্যুতি ভরিয়ে দিয়েছে বিষণ্ণতম তারা।

ছাপোষা মন

বেনজির শিকদার

নিউ ইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সে কোনো অভাবনীয় সঙ্গ চায়নি
চায়নি অপ্রত্যাশিত অনুপম স্পর্শ।
অচেনা আগন্তুকের মতো আকাঙ্ক্ষার ঝলকে
মাথায় ভর করেনি কোনো কাঙ্ক্ষিত স্বরলিপি।

ছাপোষা নিম্নমধ্যবিত্ত মন,
অভাবের পীড়নে একটু কেবল জীবনের প্রার্থনা ছিল।
স্রোতহীন লবণাক্ত ধারায় ভিজে স্বপ্ন এঁকেছিল;
কিছু ক্ষুদ্রায়ু ধরে অন্তহীন বেঁচে থাকার অভিপ্রায়ে।

তুমুল সৌন্দর্য কাবু করতে না পারলেও
দিনান্তে ভেতরের টানাপোড়েন কাটতে জানতো বেশ!

নিয়ম করে দেখতো—
ঘাত-প্রতিঘাতে ইতিহাসের বিবর্তিত রূপ—
রুদ্ধশ্বাসের ঊর্ধ্বমাত্রা আর নিম্নমাত্রায়
নৈতিক বিধানগুলোর নির্লিপ্ত তাকিয়ে থাকা।

সময়ের গর্ভে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার
আর আকাশের উপকণ্ঠে মেঘেদের কোন্দল-
কখনও কখনও বেশ ভাবাতো তাকে!

ইচ্ছে-পোড়ার গন্ধে নিরাসক্ত দর্শকের মতোই
মুষড়ে পড়ে থাকতো সন্ধ্যার দৃশ্যে।
বেঁচে থাকার মৌলিক-স্পৃহা—যাপনের খুঁটিনাটি
আর বিমর্ষ বাতাসের কলহাস্য
পাঁজর ছাপিয়ে প্রায়ই পিষ্ট হতো ক্লান্ত চরণতলে।

দূরে নির্লিপ্ততায় ইউরোপ ইতিহাসের হিংস্র অধ্যায়।
প্রতুল প্রত্যয়ে ডেকে যেত একান্ত গোপন ট্রেন—
যেখানে অপেক্ষমান—
যাপনবৃক্ষের বিষফুলে সেজে থাকা দীর্ঘশ্বাসের বাড়ি।

প্রত্যাশার মুখে লাগাম টেনে আজ বহুক্ষণ—
বুকখোলা আকাশের নিচে লোকটির মৃতদেহ পড়ে আছে।

সাবধানে থেকো, দুগ্গা

শুভশ্রী নন্দী
জর্জিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

শুনি যে রোজই ধর্ষিতা মেয়ে,
পুড়ছে মান ও ভয়!
সবক'টি ঘর একযোগে বলে
আমার বাড়ির নয়।

রেডলাইট পাড়ায়, 'হাউস ফুল' ঝোলে
বিবেক হাপিস হয়
সবঘর থেকে ঝাণ্ডা উড়ছে
'আমার কেউ নয়'।

শুনি যে তবে 'মি টু'-র মুখে
মুখ চাপা দেয়া হয়
সব ঘরগুলো দৃঢ়তায় বলে
আমার বাড়ির নয়।

সব ঘরগুলো খুঁজে খুঁজে
তাই, পুলিশ হন্যে হয়
এঘর আঙুল ওঘরে তোলে
সময় নষ্ট হয়।

বাসে ট্রামে চলে ছোঁয়াছুঁয়ি রোগ
বিরক্ত হয় সবে
নিজের ঘরের যদি কেউ হয়
'খেলাখেলি' দেখি তাকে।

ধমকানি আর চোখরাঙানির
ড্রিল সওয়া রেওয়াজে
স্বাধীন বুলি বন্দি তোতার
কণ্ঠ আর আওয়াজে।

দুর্গা, তুমি আসছ তো জানি
দশহাতে নিয়ে অস্ত্র
সাবধানে থেকো, ভরসা নেই
কখন করে বিবস্ত্র।

করজোড়ে সব, সব ঘর থেকে
বেরোবে তোমার জন্য
মন্ত্র বলবে অঞ্জলি দেবে
মুখে ও মুখোশে অন্য।

ত্রিশূলকে তুমি বলে রেখো তাই
সদাই সজাগ থাকতে
চারপাশ দেখে, অসুরকে দেখি
লজ্জায় মুখ ঢাকতে।

তোমারও ইচ্ছে তিনদিন নয়,
তিন মাস জুড়ে থাকতে—
বাপের বাড়িতে মেয়েদের ভয়
পারছো না আর দেখতে!

তবু তিনদিনই সই
তুমি এসো মাগো
আমাদের মুখ চেয়ে
যে ক'টি মানুষ জীবন লড়ছে
'সুবিচার' দাবী নিয়ে।

চার ছেলেপুলে সামলে রেখো মা,
ভরসা নেই কোথাও
কোনমতে তুমি মানে সম্মানে
কৈলাশে ফিরে যাও।

তকমা

মৌমন মিত্র
নিউ জার্সি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

তুমি অর্থ সমগ্র হতে চলেছ
প্রতিবাদ, মিছিল, মোম নির্ভর কিছু
ডটপেনের লাইন, তোমাকে তকমা দেবে
এই আশায় এখন তুমি কয়েক পা বাড়াবে

সূর্য
দেবী
পক্ষ
অস্ত গেলেই
ফের ফ্যালাসি—

এমন একটা ঝড়

তার ...পর?
জড়াবে
মানি প্ল্যান্ট নকশায়
সমুদ্র তোমাকে তাড়া করবে
পথ বাঁক নেবে। বলব কবিতায়?
আর বলা মানায়?

তার পরখ এমনও দিন আসবে
একসময় শক্তি স্রাবের রং বুঝবে
ঢাক বাজবে

আর বলা মানায়? পুড়তে পুড়তে—

হে শ-শ সপ্তর্ষি
বলেছিলাম না,
ঘাতক বিষিয়ে, পর পর
অপূরণীয় অর্থ সমগ্র হবই হব!

আর কি সত্যি হায়, বলো তো মেঘ,
বৃষ্টি কখনও বিফলে যায়?

ভ্যাবাচ্যাকা

অনিন্দিতা চৌধুরী

নিউ জার্সি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

'আরে মিলিদি, কতদিন পরে দেখা! কোথায় ছিলে এদ্দিন? শরীরটরির ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ রে, ছুটি নিয়েছিলাম, একটু ঘুরে এলাম। তুই ভালো আছিস?'

'কোথায় গেছিলে? ছবি দেখলাম না তো কিছু!'

'আমার ননদের ওখানে। বর যাচ্ছিল অফিসের কাজে, আমরাও অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম, যোগারপাতি করছিলাম, এবারে ঘুরেই এলাম। আমার ননদের বাড়ি তো...'

'ধুর, শখ করে কেউ ননদের বাড়ি যায়! তুমি পারোও বটে মিলিদি! আমি তো নেহাত দায় না পড়লে শ্বশুর বাড়ির লোকের সঙ্গে মিশিই না। তাই তোমার কোনো ছবি দেখলাম না, ভালো টুরিস্ট স্পট কোথাও গেলে ছবি দেখতাম। অবশ্য তুমি তো ছবি টবি দাও না। পাঁচ বছর ধরে একটাই প্রোফাইল পিক।'

'হ্যাঁ রে, আমি ওইসব ঠিক পারি না।'

'আরে,পারি না বললে হবে! এই দেখো আমার নতুন পিক কাল রাতেই পোস্ট করলাম। তুমি দেখনি এখনও। অন্তত লাইক দাওনি... হে হে হে! গোয়া বেড়ানোর ছবি।'

'দেখি! বাহ, খুব সুন্দর লাগছে রে তোকে, জায়গাটাও কি সুন্দর! আমার এসব দেখা হয়নি ক-দিন আসলে।'

'ওখানে গিয়ে আশ মিটিয়ে শপিং করেছি, সেজেছি, এখন রোজ একবার করে পিক পাল্টাচ্ছি। আমার বর বললো এই ড্রেসে পিক দেবে! আমি বললাম আলবাত দেবো, দেখি কে কী বলে! ধুয়ে দেবো না একদম! তোমরাও একবার ঘুরে এসো, দারুণ জায়গা। আমি সব তোমায় জানিয়ে দেবো, কোথায় ঘুরবে কী খাবে সব! এইসব ননদের বাড়ি-ফারি ছাড়ো তো... একটু ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে বলো তোমার বরকে। তুমি একটু বেশি ভালোমানুষ যাই বলো! আরে জোরজার আবদার করবে তো, নাহলে এই বরগুলো খরচ করতেই চায় না!'

'কি আর করবি বল, তোর মিলিদি আর মানুষ হলো না! তোর জামাইবাবুরই মজা, কি বল! যাই রে, আমার কারপুল এসে গেছে।'

'তোমার ঘোরার গল্প তো শোনাই হলো না মিলিদি। গেছিলে কোথায়, কোথায় থাকে তোমার ননদ?'

'নিউইয়র্কে থাকে। ওখানেই গেছিলাম তিন সপ্তাহের জন্য। আসি রে!'

'নিউইয়র্ক! মিলিদি তুমি...তুমি...নিউইয়র্ক!!!'

হেমন্তের চিঠি

মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায়
ম্যাসাচুসেট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

রাস্তাটা বেশ খানিকটা বেঁকে নেমে গেছে নীচের দিকে। অনেকটা। নামতে গিয়ে একটু হাঁফ ধরে যাচ্ছে; মিঠাই তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। ওকে ধরতে গিয়ে একটু তাড়াতাড়ি পা চালালো অর্পিতা-বাঁকটা ঘুরতেই সামনে হঠাৎ উদ্ভাসিত-এভারগ্রীন ভ্যালি। দিগন্ত ছোঁয়া, ঝকঝকে রোদ্দুরে বেছানো, প্রায় মনোক্রোমাটিক রঙের অপূর্ব সব বাড়ি গাছপালার মাঝে...দূরে পাহাড়ের সারি, আর মাথার ওপর রুপোর বাটির মতো ওল্টানো ক্যালিফোর্নিয়ার নীল, নির্মেঘ অক্টোবরের আকাশ। প্রায় দু'মাস ধরে এই রাস্তায় যাতায়াত করছে সে, অনেক বিকেলেই এই রাস্তা দিয়ে মেয়েকে সামনের চিলড্রেন্স পার্কটাতে নিয়ে যায়...কিন্তু প্রত্যেক বার এই চমকটার সামনে এসে এক মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, মিঠাইও দাঁড়িয়ে পরেছে। দুজনেই নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে কিন্তু এতো সুন্দর দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়েও মেয়ের মুখটা একটু ম্লান। এ শহরে মোটে দু-মাস এসেছে তারা, তাই এখনো এই চিলড্রেন্স পার্কে ওর জন্য কোনো বন্ধু অপেক্ষা করে নেই, আমেরিকার অন্য প্রান্তে নিউ হ্যাম্পশায়ারে ফেলে আসা বন্ধুদের মিস করে মিঠাই। আরো কিছুটা হাঁটতে হাঁটতে অর্পিতারও হঠাৎ কেমন যেন ফাঁকা লাগতে লাগলো। অনেক বছর ছিল তারা ওখানে—অনেক স্মৃতি। তাই আজ এই আলোয়-আলো দিনটাতেও কি যেন নেই...

কি নেই?

উত্তরটাও মনে এলো প্রায় সাথে সাথেই— রং নেই। এই সময়ে আমেরিকার উত্তর পূর্বের রাজ্য গুলোতে দিন রং-এ ভরা। চেনা গাছগাছালি, অচেনা রাস্তা, পাহাড়, জঙ্গলে এখন লাল, কমলা, হলুদ, আগুনে রঙের হোলিখেলা। এখানে সেই রংটাই দেখতে পাচ্ছে না সে...

হঠাৎ করে মনে পড়লো তার—যে বছর সে এদেশে আসে, সেটা ছিল সামার। তারা প্রথম আসে বস্টনের সাবার্বে একটা ছোট্ট শহরে। গাঢ় এক জংলা সবুজে ভরা চারদিক, এতো সবুজ অনেক বছর বাদে দেখলো অর্পিতা। কয়েক মাস বাদেই রাজার মতো এলো হেমন্ত, এখানে ডাকা ফল বলে, রঙের বিস্ফোরণ চারপাশে। তাদের বিয়ের আগে প্রায় পাঁচ বছর তার স্বামী পল্লব এই অঞ্চলে ছিল, ফল তার অত্যন্ত প্রিয় ঋতু। নতুন বৌকে নিয়ে ছোট, বড় সবরকম ড্রাইভে বেরিয়ে পড়তো। কিন্তু অর্পিতার মনে তার ছোঁয়া লাগেনি। কোনোদিন বাড়ির থেকে আলাদা না হওয়া অর্পিতা, একই শহরে বড় হয়ে ওঠা অর্পিতা, তীব্র ভাবে মিস করতো তার মা কে, বাড়ি, বাকি পরিবার, তার শহর, বন্ধু...ফেলে আসা দুর্গাপুজো।

ছোটোবেলায় প্রত্যেক বছর দাদুর গ্রামের বাড়িতে কালীপুজোতে যেত—বাংলা বিহারের সীমান্তে চাকুলিয়া বলে ছোট্ট সেই জায়গা, স্টেশনে ট্রেন পৌঁছতো শেষ সন্ধ্যেয়, প্লাটফর্মে নেমে মনে হতো যেন মাঝরাত। অন্ধকারে স্টেশন থেকে বাড়ি যাবার রাস্তাটা কিছুটা হেঁটে...কিছুটা কারোর কোলে। হাওয়ায় শীতের কামড়—সমস্ত শরীরে কাঁটা দিতে শুরু করতো,...তার সাথে একটা সতেজ গন্ধ মনে হতো যেন নাক মুখ দিয়ে হিম ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। প্রায় কিছু দেখা যাচ্ছে না পথের, সামনে মামা সাইকেল নিয়ে আর দাদুর হাতের টর্চ থেকে যতটুকু আলো...রাস্তার দু-দিকের খোলা মাঠ...জলা সব একাকার হয়ে গেছে, ...শুধু কুয়াশা জমাট বাঁধা...আর জোনাকি তার মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে দাদুর ইতস্তত কাশি, ক্ষীণ আলোয় দেখতে পাওয়া একটুখানি পথ, নিজেদের মধ্যে মৃদু কথা আর সাইকেলের বেল-কিছুই যেন ওই কুয়াশাময় অন্ধকার পেরিয়ে কোথাও যাচ্ছে না অথচ ওই দৃশ্যটাই কত অনায়াসে পেরিয়ে গেছে সময়ের সীমানা, থেকে গেছে ...তার মনে ফ্রেম বন্দি হয়ে—ওই ছবিটাই তার শৈশবের হেমন্ত।

পরের দিন সকালে দোতলার জানলা থেকে দেখা খোলা মাঠ...ফসলহীন ক্ষেত, এক বিরাট সীমানাহীন আকাশ,

জায়গায় জায়গায় ঘন হয়ে থাকা বিরাট বিরাট গাছ, দূরে ডুমুরিয়া পাহাড়ের রেখা... মধ্য কলকাতার ইঁট, কাঠ, ঘর বাড়ি দেখা তার ছোট্ট বুকটাতে যেন এঁটে উঠতো না...বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা, যে রাস্তা দিয়ে তারা কাল এসেছে, পাকা নয়...চুন আর পাথর মেশানো। আজ সকালের হাহা করা রোদ্দুরে স্পষ্ট, সাধারণ...কিন্তু কি অনির্দিষ্ট, কতদূর চলে গেছে। ওই জানলাটাকে যেন মনে হতো ট্রেনের জানলা, বাইরের সবকিছুকে মনে হতো এখনই হারিয়ে যাবে। যেতও দু-তিনদিনের মধ্যে ফিরতে হতো কলকাতায়।

দাদু মারা যাবার পর, অনিয়মিত হয়ে গেল যাওয়া, পাল্টে গেল সময়টার ছবি। এই নতুন ছবি তার শহরের মধ্য কলকাতায় ধুমধাম করে কালীপ্রতিমার বিসর্জন, শুকনো হয়ে আসা হাওয়া, শেষ রাত্রে ঘুমের মধ্যে টেনে নেওয়া চাদর, উৎসব শেষের শূন্যতা, আসন্ন পরীক্ষার ভয়ে পড়াশোনা আবার শুরু। তখনো হাওয়ায় ভেসে আসতো মাইকে বাজতে থাকা পুজোর গানের ছেঁড়া ছেঁড়া কলি, আর হঠাৎ হঠাৎ প্রায় ফুরিয়ে আসা বাজির বারুদের একটা ফিকে গন্ধ। অনেক বছর পরেও রাত্রে কোনো জায়গা থেকে নিউ হ্যাম্পশায়ার ফেরার সময় মন হুহু করতো...হাওয়ায় খুঁজতো সেই ফেলে আসা বাজির গন্ধ; তার হাজার হাজার মাইল দূরে ফেলে আসা সময়ের অনুষঙ্গ।

বছর কাটতে থাকে, বাড়তে থাকে বয়স। ধীরে ধীরে প্রত্যেক বছর ফলের ওই রঙের ম্যাজিক, সম্মোহিত করে ফেলতে থাকে তাকেও। নেবারহুড থেকে বেরিয়েই একটা ছোট্ট উডসের সমস্ত গাছের পাতা হলুদ..., একটা সম্পূর্ণ হলুদ জঙ্গল, তার বাড়ির ঠিক সামনে একটা প্রকাণ্ড ম্যাপেল গাছ আপাদমস্তক ক্রিমসন লাল, নতুন বেনারসি পরা বিয়ের কনের মতো...কমলার যে এতোরকম শেড হতে পারে! ব্যাকইয়ার্ডে মরচে-কমলা মেপলের গা ছুঁয়ে আসা পিতল রং হয়ে যাওয়া রোদ্দুরে এক দুপুর ভালোবাসা,পায়ের নীচে নানা রঙের পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। কোনো এক মেঘ কুয়াশার ভরা শিরশিরে দিনে, হোয়াইট মাউন্টেন এর চেনা-অচেনা রাস্তায় লম্বা ড্রাইভ....পথের পাশে কোনো ছোট্ট ক্যাফেতে গরম পাম্পকিন পাই, আর ফ্রেশ কফির গন্ধ।

এখনো তার মনে আছে, একবার একটা পাহাড়ে ট্রেকিং করছিলো তারা, হোয়াইট মাউন্টেন রেঞ্জের একটা ছোট পাহাড়, মাউন্ট কার্ডিগান। প্রথম আধঘণ্টাতেই জিমে না যাওয়া, নিজের ভাষায় ফিজিক্যালি আনফিট অর্পিতা হাঁপিয়ে গেল। মুখ বন্ধ করে চড়াই ভেঙে চলা একটানা। ভাঙা ছোট বড়ো পাথর, গাছের শিকড়, ভিজে পাতা-এ সমস্ত কিছুতে মনোসংযোগ করে উঠে যেতে হচ্ছে, সাথে আছে পল্লবের দু'জন কলিগ, আর তাদের স্ত্রীরা; সবাই বেশ তরতর করে উঠে যাচ্ছে। পায়ের ব্যাথা, নিঃশ্বাসের কষ্ট, ফ্রাস্টেশনে অর্পিতার চোখে প্রায় জল...পল্লব তার জন্য থামছে আর বলে যাচ্ছে

'একবার ওপরে উঠলে কিন্তু আর কষ্ট থাকবে না অর্পি'—

বেশ অনেকটা সময় পর, বাকি দলের প্রায় আধঘণ্টা বাদে...গাছহীন এক অনন্ত পাথুরে চড়াই পেরিয়ে, ওপরে উঠে এলো তারা -পায়ের অনেক অনেক নীচে পড়ে আছে এক আগুনরঙা পৃথিবী। লাল, কমলা, মরচে, বাদামি, সবুজ, নিষ্পত্র গাছের মাঝে মাঝে নীলচে লেক। হ্যাঁ—এই দৃশ্যের জন্য স্বীকার করে নেওয়া যায় বাতাস কমে যাবার কষ্ট। পায়ের ব্যথা মিলিয়ে গেছে কখন...শুধু চুপ করে বসে থাকা, কিছু মুহূর্ত ধরে রাখা। যা থাকবে না-এই রং, এই সময়টা—যা কখনো কখনোই ধরা দেয় নশ্বর চোখে, আর হয়তো পুনরাবৃত্তি হয় না।

আজ পার্কে বসে তার দোলনায় দোলা মেয়ের দিকে তাকিয়ে মনে হলো...

ছেলেবেলার হেমন্তের সেই মায়াবী কুয়াশা, নিউ ইংল্যান্ডের শরতের রঙের সেই আশ্চর্য ম্যাজিক—সবই তো রয়ে গেছে তার কাছে থাকবেও সারাজীবন। কিন্তু এই যে প্রত্যেক দিন একটু একটু করে বড় হতে থাকা তার ছোট্ট মেয়েটার সাথে কাটানো এই বিকেল—দোলনায় দুলতে দুলতে একটু একটু করে ওপরে উঠছে ও, আবার নেমে আসছে...আবার ওপরে উঠছে আরো...ওর হাসি ফিরে আসা কচি মুখটাতে রোদ্দুর হাওয়ার লুটোপুটি, মাথার ওপর ওই অবিশ্বাস্য নীল আকাশ, চারদিক থেকে ভেসে আসা উইন্ডচাইমের শব্দ—

এটাও থাকুক। থেকে যাক।

তার স্মৃতিতে-মেয়ের শৈশব হয়ে...

প্রবন্ধ

পুজোর স্মৃতি কাশ নয়, বাঁশ

সফিক আহমেদ

টেক্সাস, আমেরিকা

এখন বড়ো হয়ে শরতের কাশফুল বা নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো ভাসমান শুভ্র মেঘ নিয়ে আসে দুর্গাপুজোর আগমনী সংবাদ তবে আমার ছেলেবেলার দুর্গাপুজোর স্মৃতি জড়িয়ে আছে কাশ নয় বাঁশ এ।

পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশেই ছিল আমার বাড়ি আর স্কুল ও কাছেই। বাল্য আর কৈশোর কালের স্মৃতি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রেখেছে পাকসার্কাস বেনিয়াপুকুর সংযুক্ত পূজা কমিটির সার্বজনীন দুর্গোৎসব আর একমাসব্যাপী মেলা।

পার্কসার্কাস এর পুজো ছিল সর্ব অর্থে সার্বজনীন। কসমোপলিটান এরিয়াতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সবার কাছেই ছিল বাৎসরিক সামাজিক উৎসব আর সবাই মহা উৎসাহে অংশ গ্রহণ করতো এই শারদোৎসবে।

পুজোর একমাস আগে স্কুলফেরত যেদিন চোখে পড়তো লরি ভর্তি বাঁশ ফেলা হচ্ছে পার্কসার্কাস ময়দানে শুরু হয়ে যেত আমাদের চরম উত্তেজনা।

ডেকোরেটরদের একদল তৈরি করতো মেলা প্রাঙ্গণ আর আরেক দল মূল দুর্গা মণ্ডপের বিশাল বাঁশের কাঠামো আর তারপর ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিয়ে তৈরি হতো ছাদ আর আমরা দিনের পর দিন তিল তিল করে গড়ে ওঠা মণ্ডপকে অবাক বিস্ময়ে দেখতাম কিভাবে বাঁশের খাঁচাকে রঙিন কাপড় দিয়ে মুড়ে অলীক স্বপ্নপুরী করে তুলেছে খেটো ধুতি বা লুঙ্গি পরা আর কাঁধে গামছা দেয়া মজুররা। তারপর মণ্ডপের আলোকসজ্জা শেষে অধীর অপেক্ষা রমেশ পাল এর তৈরি দেবী মূর্তির আগমন আর উদ্বোধন এর জন্য।

অন্যদিকে গড়ে উঠতো মূল মণ্ডপ ঘিরে মেলা প্রাঙ্গণ আর আমাদের বাঁশে উঠে দোল খাওয়া। প্রায়ই তাড়া করতো মজুররা আমাদের বাঁশের ধাঁচা থেকে নামানোর জন্য। একটা থেকে নেমে আবার অন্য জায়গায় উঠতাম সে এক ভারী মজার খেলা।

একে একে আসতে শুরু হতো মেলার পসরা। বড় দোকানগুলো আসার আগেই এসে যেত পার্শ্বচরিত্ররা। চটের পর্দা লাগানো বোর্ড এ বেলুন সাঁটিয়ে এয়ারগান দিয়ে শুটিং প্রাকটিস, গ্রিপ টেস্টার মেশিন ধরে ঝুলে পরে কাঁটা ঘোরানোর চেষ্টা, বিহারি মহিলার ভুট্টা নিয়ে বসা, তালপাতা আর কাঠি দিয়ে হাত-পা নাড়া পুতুল আর ঘূর্ণি, গ্যাস বেলুন, বুড়ির চুল, ঘুগনি আলুরদম, ফুচকা আরো কত কি। এদের ব্যবসার রমরমা পুজো আর মেলা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত। তারপর এরা বিতাড়িত মেলা প্রাঙ্গণ থেকে। এর পর এসে যেত নাগর দোলা যাতে দু-একজন ঝুলে পরে প্রচণ্ড জোরে টেনে নামাতো নাগরদোলার চাকা আর উপর থেকে নামার সময় পেট খালি হয়ে যাওয়া আর চিৎকার, যত চিৎকার ততো বাড়তো ঘোড়ার গতি, আর ছিল মেরি গো রাউন্ড এ হাতি-ঘোড়ার পিঠে বসে চক্কর। এসে যেত মেলার বিভিন্ন স্টল এ ভারতের সব প্রদেশের শাড়ি, হ্যান্ডলুম, হ্যান্ডিক্রাফট, রান্নার যান্ত্রিক সরঞ্জাম, রুটি বানানোর মেশিন, সবজি কাটার যন্ত্র দিয়ে সমানে কেটে যেত বিভিন্ন সবজি,আর ছিল 'লেলেম বাবু ছে আনা' চিৎকার করা হরেকরকম ছোটছোট জিনিসের দোকান। দোকানির হাতে একটা লম্বা ডান্ডার মাথায় একটা চামচ বাধা থাকতো। অদ্ভুত দক্ষতায় ডাই করে রাখা ছোট-ছোট জিনিসের থেকে তুলে আনতো ঠিক যেটা কিনতে চাইছে কেউ। সবচেয়ে বড় খেলনার দোকানে এক ষণ্ডা মার্কা বিশাল গোঁফওয়ালা লোক ছিল তাকে যেই আমরা বলতাম রাবন এটার দাম কত, রে-রে করে তেড়ে এসে অশ্রাব্য গালাগাল দিতো আর আমরা দিতাম দৌড়। আর ছিল লটারির দোকান, প্রত্যেক এক ঘণ্টা টিকেট বিক্রি হত আর হাতে পাওয়া যেত একটা নম্বর, তার পর ঘুরতো চাকা, দেয়ালে ঝোলানো সাইকেল, দেয়াল ঘড়ি আর দামি দামি প্রাইজ মেলার শেষ পর্যন্ত দেয়ালেই থেকে যেত। প্লাস্টিকের কি-রিং একদিকে লাভ চিহ্ন আর অন্য দিকে নাম লেখানোর মেশিন নিয়ে বসতো এক পাঞ্জাবি। প্রচুর ভিড় তার দোকানে। মেলার অন্য প্রান্তে খাবার দোকান, আজকের পোশাকি নাম ফুডকোর্ট, সবচেয়ে বেশি মনে আছে ঢাকাই পরোটা আর চাটের দোকান, থাকে থাকে সাজানো থাকতো খাবার পশরা।

ষষ্ঠীতে দেবীর উদ্বোধন হতো স্থানীয় নেতা বা কখনো ফুটবল খেলোয়াড় বা ফিল্ম স্টারকে দিয়ে। শুরু হয়ে

যেত ঢাকে কাঠি পড়া আর কাসর ঘণ্টার আওয়াজ। আসা শুরু হতো বাহারি সাজগোজে মানুষের ঢল। সুসজ্জিত নারী পুরুষ বাচ্চা গিজগিজ করতো, আর মাইক এ বাজতো বাংলা গান, সেতার বা সরোদ। মেলার মাঝখানে একটা প্যাগোডা তে ছিল পুজো কমিটির অফিস, পাড়ার বাবা, কাকারা ধুতি পাঞ্জাবি পরে গম্ভীর মুখে কমিটির কাজ নিয়ে ব্যস্ত আর ফাইফরমাশ খাটতো বাকি ভলান্টিয়ার রা। দৈনন্দিন জীবনে এনারা হয়তো অনেকেই খুব লব্ধপ্রতিষ্ঠিত নয় কিন্তু পুজোর ক'দিন তাদের গাম্ভীর্য আর দায়িত্বশীলতা দেখার মতো। এখনো কানে বাজে এখানে একটা বাচ্চা পাওয়া গেছে, বাবার নাম দীনেশ, শেওড়াফুলি থেকে এসেছেন, যেখানেই থাকুন সত্তর পূজা কমিটির অফিস এ যোগাযোগ করুন। এই বলে বাচ্চার গলার স্বর আর কান্না ও শুনিয়ে দেওয়া হতো। আর ক্ষণে ক্ষণে গান থামিয়ে ঘোষণা কারো স্বামী হারিয়েছে কারো বা স্ত্রী। একটা দুল পাওয়া গেছে, মানিব্যাগ পাওয়া গেছে, উপযুক্ত প্রমাণ সহযোগে পূজা কমিটির অফিস থেকে সংগ্রহ করুন। গান, সেতার, সরোদ, সাঁনাই আর মাঝে মাঝে হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের ঘোষণা নিয়ে তৈরি হত অদ্ভুত আবহ।

ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী দিন-কে-দিন বাড়তো মানুষের ভিড়। অষ্টমী, নবমীতে স্পেশাল ধুনুচি নাচের প্রতিযোগিতা, ধোয়া আর ছিটকে পড়া আগুনের ফুলকি দেখে মোহিত হয়ে যেতাম। দেখতে দেখতে দশমী, আবির খেলা আর বিসর্জনের সুর। নিয়ম করে দশমীতে বিসর্জন হতো। আজ কাল কার মতো কখনই দু-একদিন বেশি রাখা হতো না প্রতিমা।

এরপর পুজোর মণ্ডপের হতো রূপান্তর, ঘিরে দেওয়া হতো করোগেটেড টিনের বেড়া দিয়ে। শুরু হত ২১ দিন ব্যাপী বিচিত্রা অনুষ্ঠান, নাটকের কম্পেটিশন আর যাত্রা। ডেইলি বা season টিকেট কিনতে হত। আমরা পূজা কমিটির হর্তাকর্তা বাবা, কাকাদের দেওয়া পাস-এর মুখ চেয়ে বসে থাকতাম আর ভরসা ছিল টিনের বেড়ার ফুটোতে চোখ রেখে দেখা। যাত্রা দেখতে দেখতে লোম খাড়া হয়ে যেত, এখন বুঝি সেটাকে goosebump বলে।

একমাস পর বেজে উঠতো বিদায়ের সুর। খুলতে শুরু হত টিনের বেড়া, মণ্ডপের কাপড়, বেরিয়ে আসতো বাঁশের কাঠামো, মেলার দোকান এক-এক করে গুটিয়ে তুলতো তাদের পশরা।

কয়েকটা দোকান শেষ পর্যন্ত পরে থাকতো ব্যবসার লোভে। শেষ দোকান তুলতো রাবন। আমরা অবশ্যই শেষ দিনে সমস্বরে রাবন রাবন বলে তাকে উত্তক্ত করতাম তবে তখন আর তেড়ে আসতো না আর গালাগালি ও দিতো না। তার ও মনে বাজছে বিদায়ের সুর।

এক মাসের স্বপ্নপুরী আর সুসজ্জিত মেলা প্রাঙ্গণ বদলে যেত এবড়ো-খেবড়ো মাঠে আর ডাই করা স্তূপাকৃতি বাঁশ-এ। লরি এসে তুলে নিয়ে যেত বাঁশ আমাদের প্রতীক্ষা হত শুরু আসছে বছর কবে পড়বে বাঁশ।

আজ বহু বছর দেশ ছাড়া, আমেরিকা, কানাডা বা মধ্যপ্রাচ্যের বাঙালিদের দুর্গাপূজা আর শারোদোৎসবে যোগ দিয়েছি। কোথাও কমিউনিটি হল এ পুজো আর অনুষ্ঠান, কোথাও বা সাড়ম্বরে মন্দিরে পুজো আর আর সুসজ্জিত অডিটোরিয়ামে নাটক, গানের আসর, জাকজমকের অভাব নেই তবুও মনের কোন খুঁজে ফিরি ছোটবেলার পুজো, পুজোর মেলা আর বাঁশের মণ্ডপ।

Editorial Committee

Sudipta Chattopadhyay
Lipika Mukhopadhyay

Board of Trustees 2023

Dilip Chakrabarti	Chairperson
Abhik Dasgupta	Member
Ashis Sengupta	Member
Ashok Rakhit	Member
Gopendu Chakrabarti	Member
Kallol Chattopadhyay	Member
Milan Awon	Member
Pranab Das	Member
Sugata Bagchi	Member
Surajit Sengupta	Member

Executive Committee 2023

Ranadeb Sarkar	President
Tapas Sanyal	Vice President
Arpita Gupta	Vice President
Dipayan Sarkar	Vice President
Partha Sarathi Chakrabarty	General Secretary
Indrashish Basu Roychoudhury	Assistant Secretary
Debiprosad Palit	Treasurer
Sudipta Chattopadhyay	Member
Dipankar Chattopadhyay	Member
Lipika Mukhopadhyay	Co-Opt Member
Amitabha Choudhury	Co-Opt Member
Amit Ganguly	Co-Opt Member
Pradip Gupta	Co-Opt Member
Hasanuzzaman Saki	Co-Opt Member
Piya Roy	Co-Opt Member

প্রকাশকর্ম সহযোগিতায়

RAUNAQ
PUBLICATION

Books Events and More.

কলকাতা, ভারত